দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৭০ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা।। ১১ জুন ২০১৮।।
২৭ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০
website : www.eswastika.com

নামে মাত্রই মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন কুমারস্বামী

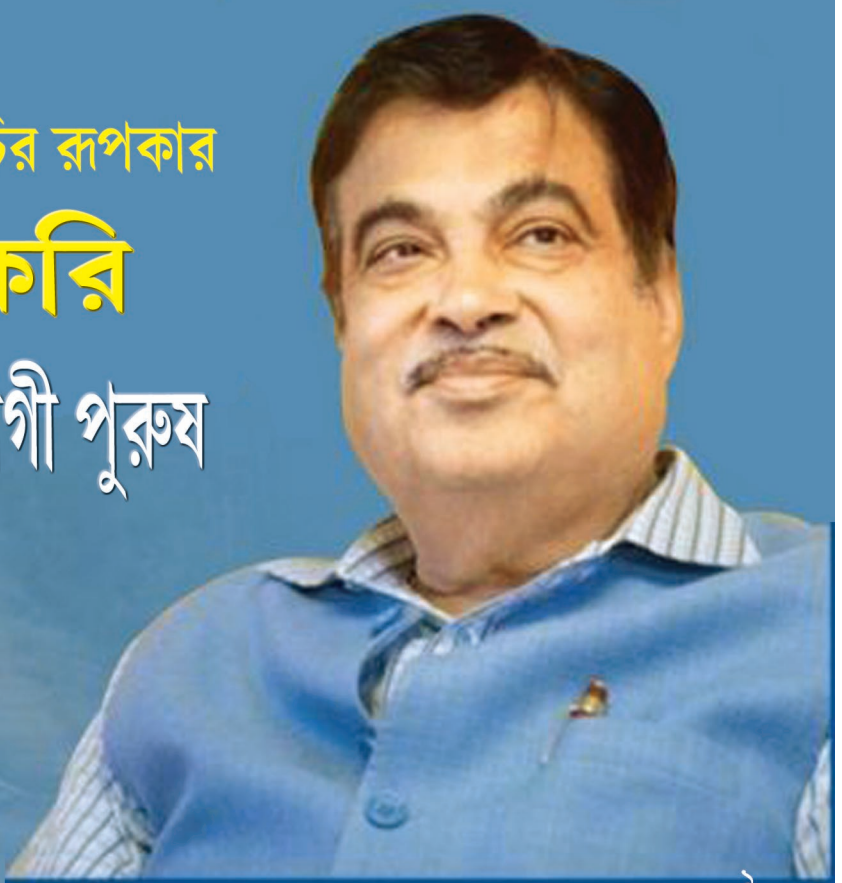

কেন্দ্রের ভারত নির্মাণ কর্মসূচির রূপকার
নীতীন গড়করি
এক দায়িত্ব সচেতন উদ্যোগী পুরুষ

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১১ জুন - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

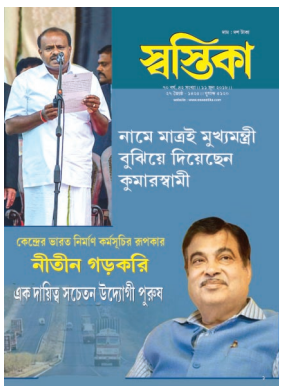

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সাম্প্রতিক উপনির্বাচনগুলি বিজেপির জন্য ওয়েক আপ কল ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৬

খোলা চিঠি : অভিষেকের তদন্ত করবে কে? ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

বিরোধীদের অনৈতিক জোট ২০১৯-এ বিজেপির কাছে উপহার হয়ে আসবে ▯ রামমাধব ▯ ৮

নামে মাত্রই মুখ্যমন্ত্রী, বুঝিয়ে দিয়েছেন কুমারস্বামী ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১১

তর্কবাগীশ সবজান্তা বামপন্থী এবং মূর্খ মাঝির গল্প.. ▯ স্বনাম গুপ্ত ▯ ১৩

নতুন ভারতের নতুন নেতৃত্ব ▯ ১৬

দ্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন : 'আর দেরি নয় ধর গো তোরা হাতে হাতে ধরগো' ▯ ১৭

নীতীন গড়করি : এক দায়িত্ব সচেতন উদ্যোগী পুরুষ ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২৩

মেক ইন ইন্ডিয়া এবং স্কিল ইন্ডিয়াকে সঠিকভাবে কাজে লাগালো কেন্দ্রীয় পরিবহন ও সড়ক যোগাযোগ মন্ত্রক ▯ ২৬

মোদীর ভারত নির্মাণ কর্মসূচির স্বপ্নের দিশারী বন্দর ও জাহাজ মন্ত্রক ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৯

পাপহারী দশহরা একটি জাতীয় উৎসব ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

চাকদহ ও দেবগ্রাম ▯ জলজ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩২

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত ▯ সলিল গেঁউলি ▯ ৩৩

প্রাক্-স্বাধীনতাকালীন বাংলা কবিতা ও গানে স্বদেশ ভাবনা ▯ গৌতম কুমার মণ্ডল ▯ ৩৫

সংবাদপত্রের দায়বদ্ধতা ▯ গৌতম কুমার মণ্ডল ▯ ৪৩

গণতন্ত্রকে হত্যা করে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা সার্থক হতে পারে না ▯ কে এন মণ্ডল ▯ ৪৪

জ্যৈষ্ঠমাসের চাষবাস ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **চিত্রকথা : ৪০** ▯ **রঙ্গম : ৪১**▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
১৮ জুন, '১৮

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গে শাসকের সন্ত্রাস

প্রকাশিত হবে
১৮ জুন, '১৮

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে শাসকের সন্ত্রাস দেখেছেন। আশা ছিল, ভোট মিটলে শান্তি ফিরবে রাজ্যে। কিন্তু ফল ঘোষণার পর দেখা গেল সন্ত্রাস আরও বেড়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেখানে যেখানে বিজেপি ভালো ফল করেছে সেইসব অঞ্চলে লাগামছাড়া সন্ত্রাস চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই পুরুলিয়ায় তালিবানী কায়দায় ত্রিলোচন মাহাতো এবং দুলাল কুমারকে খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে তৃণমূলের গুণ্ডারা। ঝাড়গ্রামেও চলছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর তৃণমূলী অত্যাচার। আক্রমণ করা হচ্ছে বিজেপির কার্যালয়ে।

আগামী সংখ্যায় শাসকের এই অভূতপূর্ব সন্ত্রাসের ঘটনাই তুলে ধরবে স্বস্তিকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

একতরফা সংঘর্ষ বিরতি প্রত্যাহার চাই

আবার তপ্ত ভূস্বর্গ। রমজান মাসেও চুক্তি ভঙ্গ করিয়া নিয়ন্ত্রণরেখায় গোলাগুলি চালাইল পাক সেনা। কাশ্মীরে ভারত সরকারের একতরফা যুদ্ধবিরতিকে জয়েশ-ই-মহম্মদ প্রধান মওলানা মাসুদ আজাহার বিদ্রূপ করিয়া ইহাকে ভারতে প্রবেশের 'সুবর্ণ সুযোগ' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিল। এই হুমকির পরে পরেই আবার রক্তাক্ত হইল কাশ্মীর উপত্যকা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানাইয়াছে, পাকবাহিনীর হামলায় গত দশদিনে জম্মু, কাঠুয়া ও সাম্বা সেক্টরে বিএসএফ-সহ সাধারণ মানুষ অন্তত ১৫ জন নিহত হইয়াছেন। গত ৪ জুন পুলিশকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত গ্রেনেডে শোপিয়ানে ১৬ জন জখম হইয়াছে। সীমান্তের ওপার হইতে পাক সেনা যখন নিরন্তর গোলাগুলি বর্ষণ করিতেছে, অন্যদিকে তখন উপত্যকায় পাথরবাজদের দুঃসাহস ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু যে কারণেই হউক মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি তাহাদের প্রতি নরম মনোভাব প্রদর্শন করিতেছেন। এমনকী তাহাদের ক্ষমা করিবার কথাও বলিতেছেন। বাহির ও ভিতরের দুই হামলায় কাশ্মীর এই রমজান মাসেও আবার উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রমজান মাস উপলক্ষ্যে ভারত সরকার একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিয়া প্রতিবেশী দেশের প্রতি যে সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছিল, ইহার মর্যাদা তাহারা রক্ষা করে নাই। এক সপ্তাহ পূর্বে ভারতের পাল্টা হামলায় বিপর্যস্ত পাকিস্তান ১৫ বছরের পুরানো সংঘর্ষ বিরতি চুক্তির প্রস্তাব করিয়াছিল, তখনই সন্দেহ ছিল যে এই প্রস্তাব তাহারা নিজেরা কতদিন মানিয়া চলিবে। ভারতের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না পাকিস্তানের আচরণই তাহার প্রমাণ। বস্তুত সংঘর্ষ বিরতি বা আলোচনা প্রস্তাবের নামে নিজেদের ঘর গুছাইয়া লইয়া তাহারা আবার হামলা চালাইতেছে। তাই ভারতীয় সেনাদের যে আরও সতর্ক থাকিতে হইবে তাহা বলা বাহুল্য। সংঘর্ষ বিরতির চুক্তি বার বার লঙ্ঘন করিবার জন্য আরও এক দুষ্পরিণাম হইল সীমান্তবর্তী ক্ষেত্রে বসবাসকারী কয়েক হাজার মানুষকে সরাইয়া আনিয়া নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। এইরূপ ব্যবস্থা এই প্রথমবার করিতে হইতেছে এমন নয়, ইহার পূর্বেও ভারতকে করিতে হইয়াছে। এই কথা ঠিক, সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করিবার জন্য ভারতীয় সেনাদের কড়া জবাবে পাকিস্তানেরও বহু ক্ষয়ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু তাহারা ইহা হইতে কোনও শিক্ষাই গ্রহণ করে নাই। ভারতের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষই পাকিস্তানের এমন আচরণের মূল কারণ।

বস্তুত কোনও সভ্য জাতির মতো আচরণ করিতে পাকিস্তান ভুলিয়া গিয়াছে। আর এই কারণের জন্যই পাকিস্তান জঙ্গি সংগঠনগুলিকে মদত দিয়া চলিতেছে, তাহাদের দেশকে জঙ্গিদের আঁতুড়ঘর বানাইয়াছে। শুধু ভারত নয়, আজ সমগ্র বিশ্বই সন্ত্রাসবাদে মদত দিবার জন্য পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াছে। তাই কোনও সভ্য দেশের প্রতি যে ব্যবহার করা যায়, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য হইবে না। যে সৌজন্য দেখাইয়া রমজান মাসের জন্য ভারত একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করিয়াছিল, পাকিস্তান তাহার মর্যাদা রক্ষা করে নাই। তাই একতরফা সংঘর্ষ বিরতি অবিলম্বে প্রত্যাহারই সমুচিত কাজ হইবে।

সুভাষিতম্

অর্থিতো ব্যাধিতো মূর্খঃ প্রবাসী পরসেবকঃ।

জীবন্তোঽপি মৃতাঃ পঞ্চ পঞ্চৈতে দুঃখভাগিনঃ।। (চাণক্যনীতি)

যাচক, রোগী, মূর্খ, প্রবাসী ও পরসেবক---এই পাঁচ ব্যক্তি যেহেতু সর্বদাই দুঃখভাজন হয়, তাই তারা জীবিতাবস্থায় মৃতপ্রায় থাকে।

সাম্প্রতিক উপনির্বাচনগুলি বিজেপির জন্য ওয়েক আপ কল

আত্মসন্তুষ্টি অথবা আত্মঅহঙ্কার। সাম্প্রতিককালের উপনির্বাচনে বিজেপির চরম ব্যর্থতার কারণ কী? ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় জনসংযোগের অভাব। দেশের খুব কম লোকই জানেন যে, প্রধানমন্ত্রীর মুদ্রা যোজনাটা কী বস্তু। খায় না মাথায় মাখে। তাঁর আবাস যোজনায় কীভাবে যুক্ত হওয়া যায় ইত্যাদি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে টুইটারে, ফেসবুকের মাধ্যমে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় জনপ্রকল্পের উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছতে চাইছেন। অসমের প্রত্যন্ত এলাকায় এক দরিদ্র যুবক কেন্দ্রীয় মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে চা-মিষ্টির দোকান খুলে এখন সচ্ছল হয়েছেন। মোদীজী ভিডিয়ো-কল করে যুবকের সঙ্গে কথা বলেছেন। যুবককে বলেছেন, বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ। ব্র্যান্ডিংয়ের যুগ। দোকানের মিষ্টির মধ্যে রসগোল্লাকে ব্র্যান্ড করে প্রচার করুন যে অসমের রঙ্গিয়াতে এটাই সেরা। কিন্তু একা প্রধানমন্ত্রী কতটা জনসংযোগ করবেন? তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের জনসম্পর্ক নেই কেন? দল হিসেবে বিজেপির জনসংযোগ তলানিতে ঠেকেছে। এটাই আত্মঅহঙ্কার। মোদী সরকারের চার বছর পূর্তিতে সরকারি টাকায় খবরের কাগজে পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে কাগজের মালিকদের কয়েক কোটি টাকা পাইয়ে দিয়ে দায়িত্ব পালন করা যায়। কারণ, এটা সবচেয়ে সহজ পথ। দল কী করছে? পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি এখন প্রধান বিরোধী দল। কিন্তু প্রথম স্থান দখল করতে গেলে টানা প্রচারে যেতে হবে। সেই প্রচারের মূল লক্ষ্য হবে কেন্দ্রীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সাফল্য। এই রাজ্যের মানুষ জানেই না কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সুবিধা কীভাবে মানুষ পেতে পারে। রামনবমী যদি সাফল্যের সঙ্গে এখানে করা যায় তবে সেই উৎসবের সঙ্গে মোদী সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রদর্শনীও করা যায়। বাধাটা কোথায়? তৃণমূলের উন্নয়ন যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে তবে একই স্পর্ধায় বিজেপি সরকারের উন্নয়নও রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

২০১৪ সাল থেকে সারা দেশে মোট ২৭টি লোকসভা উপনির্বাচন হয়েছে। তার মাত্র পাঁচটিতে বিজেপি প্রার্থীরা জিতেছেন।

গূঢ় পুরুষের

কলম

২২টিতে হেরেছেন। এই উপনির্বাচনগুলি দেশের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব প্রান্তেই হয়েছে। বলা হচ্ছে, উপনির্বাচনের গুরুত্ব অনেক কম। সাধারণভাবে স্থানীয় সমস্যাগুলিই উপনির্বাচনে প্রাধান্য পায়। জাতীয় রাজনীতি নয়। এতটা সরলীকরণ ঠিক নয়। বিজেপি নেতৃত্বকে জানতে হবে কী কারণে দেশের প্রায় সব বিরোধী দল নিজেদের অতীত সংঘাত ভুলে বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী লড়াইতে অবতীর্ণ হচ্ছে। একথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলবেন না যে মমতার ডাকে বিরোধীরা একজোট হয়েছে। অথবা রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী করতে অখিলেশ-মায়াবতীরা হাতে হাত ধরেছে। বিজেপির বিরুদ্ধে এতটা ক্ষোভ কেন? কর্ণাটকে এক নম্বর দল হয়েও সরকার গড়তে পারেনি বিজেপি। উত্তরপ্রদেশ বিজেপির প্রধান দুর্গ। সেই দুর্গের অপরাজেয় গোরখপুর, ফুলপুর, কৈরানা সংসদীয় কেন্দ্রে এবার বিজেপি প্রার্থীরা খারাপভাবেই হেরেছেন। সংবাদমাধ্যম বলছে, বিরোধী দলের মহাজোটকে ঠেকাতে পারেনি বিজেপি। যেমন, কৈরানা কেন্দ্রে মুসলমান এবং জাঠ ভোটাররা এককাট্টা হয়ে রাষ্ট্রীয় লোকদলের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জিতিয়েছে। প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। মুসলমান ও জাঠরা পরস্পরের বৈরী। উত্তরপ্রদেশের সর্বশেষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জাঠ এবং মুসলমানরা জড়িত ছিল। বিজেপির বিরুদ্ধে বরং অভিযোগ ছিল যে জাঠদের পাশে দাঁড়ানোর। বলা হয়েছিল, জাঠেরা মুসলমান প্রার্থীকে ভোট দেয় না। কৈরানাতে রাষ্ট্রীয় লোকদলের প্রার্থী ছিলেন মুসলমান মহিলা তবসুম হাসান। জাঠেরা দশ পুরুষের বৈরীতা ভুলে মুসলমান প্রার্থীকে ঢেলে ভোট দিয়েছেন। লক্ষ্য বিজেপি প্রার্থীকে বিপুল ভোটে হারানো।

সাদা চোখে বুঝতে অসুবিধা নেই যে বিজেপির সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। কেন? এর উত্তরটাই জানতে হবে দলকে। পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস দুর্মূল্য হয়েছে। হ্যাঁ, তাতে ক্ষোভ আছে সাধারণ মানুষের। কিন্তু আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে মূল্যবৃদ্ধি এর জন্য দায়ী তা সবাই জানে। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব বোঝাতে চাইছেন যে, আখ চাষিরা দাম পাচ্ছেন না, সেই ক্ষোভেই ভোটে হারতে হয়েছে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আখচাষিদের ক্ষোভের কথাটা দল এবং যোগী আদিত্যনাথ সরকারের অজানা ছিল না। চাষিদের ক্ষোভ প্রশমনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী কী কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন আমার অন্তত জানা নেই। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভের খবর রাখার দায়িত্ব দলের। দলীয় শক্তি এবং দুর্বলতা নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে দুর্বলতাগুলি বিশ্লেষণ করে জানতে হবে। মানুষের দুঃখদুর্দশা, চাহিদার কথা দলের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় সরকার জানতে পারে। সেটা যে হচ্ছে না তা বলাইবাহুল্য। কৈরানা কেন্দ্রে জিততে বিজেপি নেতৃত্ব সর্বশক্তি দিয়ে লড়েছিল। তখন আখ চাষিদের ক্ষোভের কথা শোনা যায়নি। হারার পর এখন শোনা যাচ্ছে। এর কারণ আত্মসন্তুষ্টি। অহমিকা। অবজ্ঞা। ঠিক মতো পরিচর্যা না করলে সাজানো বাগানও শুকিয়ে যায়। ▌

অভিষেকের তদন্ত করবে কে?

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

প্রথমে ত্রিলোচন মাহাতো। তার পরেই দুলাল কুমার। মাত্র চার দিনের ব্যবধানে দুই বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে চাপান-উতোর চলছে।

পুলিশ জানিয়ে দিয়েছে ত্রিলোচনের মৃত্যু খুনের ঘটনাই, কিন্তু দুলাল কুমারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, এটি আত্মহত্যা।

৩০ মে উদ্ধার হওয়া বিজেপি যুব মোর্চার কর্মী ত্রিলোচন মাহাতোর টি-শার্টে ও দেহের পাশে পোস্টারে লেখা ছিল, ''১৮ বছর বয়সেই বিজেপির রাজনীতি এবার তোর প্রাণনীতি হলো। তোকে ভোট থেকেই এই কাজটা করার চেষ্টা করি। পারিনি। আজকে তোর প্রাণ শেষ।''

চার দিনের মধ্যে দু'জন বিজেপি কর্মীর রহস্যজনক ভাবে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাপে পড়ে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু তদন্ত হচ্ছে তো! মানে, ঠিকঠাক তদন্ত!

দু'জনের ক্ষেত্রেই বিজেপির অভিযোগ, শাসক দলের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতেই খুন হয়েছেন এঁরা। দুলালের দেহ হাই টেনশন তারের টাওয়ার থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরিবারের বক্তব্য, শনিবার বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তার পরে বাড়িও ফিরেছিলেন। কিন্তু রাতে বাবাকে দোকানে খাবার দিতে গিয়েছিলেন। তার পরে আর বাড়ি ফেরেননি তিনি।

ত্রিলোচনের মৃত্যুর প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেলেও প্রশ্ন উঠছে কয়েকটি রহস্য নিয়ে। তার উত্তর এখনও অজানা রয়ে গেছে।

● ত্রিলোচন মাহাতো যদি খুনই হয়ে থাকে, তাহলে তাকে খুন করল কে? বিজেপি করার জন্যই তাকে প্রাণ দিতে হলে, কে বা কারা রয়েছে এই খুনের পিছনে? শাসক দল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা, না অন্য কেউ? এই প্রশ্নের উত্তর এখনও তদন্তে উঠে আসেনি।

● দুলাল কুমার যদি আত্মহত্যাই করে থাকেন, তাহলে তার কারণ কী? বাড়ির লোক দাবি করেছেন, তাঁদের কোনও পারিবারিক সমস্যা ছিল না। কোনও অর্থনৈতিক সমস্যাও ছিল না। তাহলে কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করলেন? এই প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা।

● তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়েছে, এই ঘটনার পিছনে বজরং দল বা মাওবাদীদের হাত থাকতে পারে। তার মানে কি সত্যিই এই এলাকায় মাওবাদীদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে? তারা কি এলাকায় এসে কাউকে খুন করে ঝাড়খণ্ডে চলে যেতে পারে? তা হলে এটা কি পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যর্থতা? অন্য দিকে, বজরং দল কেন নিজেদের মতাদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিজেপির কোনও কর্মীকে খুন করবে, তাও পরিষ্কার নয়। আর সেটা যদি হয়েই থাকে তবুও কি রাজ্য প্রশাসন ছাড় পেতে পারে!

রাজনৈতিক চাপান-উতোর শুরু হতেই সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। এডিজি আইনশৃঙ্খলা অনুজ শর্মা জানিয়েছেন, কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে। বহিরাগতদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হবে।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো যে পুরুলিয়া জেলাকে বিজেপি শূন্য করার হুমকি দিয়ে চলেছেন তার তদন্ত কে করবে! বিজেপির উত্থানে চাপে তৃণমূল। পুরুলিয়া জেলায় সেই চাপ আরও বেশি। ইতিমধ্যেই কোপের মুখে পড়েছে জেলা নেতৃত্ব।

ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনার তদন্ত করবে কি পিসির পুলিশ?

—**সুন্দর মৌলিক**

বিরোধীদের অনৈতিক জোট ২০১৯-এ বিজেপির কাছে উপহার হয়ে আসবে

অতিথি কলম

রামমাধব

কার্ল পল রেনল্ড নেভর নামের এক মার্কিন ধর্মতত্ত্ববিদ, নীতি শাস্ত্রজ্ঞ, রাজনৈতিক ও নাগরিক আচরণ সংক্রান্ত ভাষ্যকার একবার গণতন্ত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, ''মানুষের ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার ক্ষমতার কারণেই গণতন্ত্র টিকে থাকে, কিন্তু অনেক মানুষের আবার অন্যায় কাজ করার প্রবণতার পথে প্রতিবন্ধকতা আনতে গেলেও গণতন্ত্রেরই দরকার। গণতন্ত্রের এই মহান বিকাশ যা মানুষের ক্ষমতার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ও তার ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচিত সিদ্ধান্তের ফল তারই বিচিত্র রূপ দেখে জাতি স্তম্ভিত হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কারণে আমাদের সকলেরই বিনয়ী হওয়া প্রয়োজন। জনগণের প্রভাব দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করে— একথা বলেছিলেন, ফরাসি সমাজতান্ত্রিক কোঁতে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের কাছে 'গণতন্ত্রই ভবিতব্য'। যখন আমরা কয়েকটি রাজ্যে সরকার গঠন করলাম সেগুলি সবই গণতন্ত্রের শর্তানুগ পদ্ধতিতেই করা হয়েছিল। আবার অন্য দল যখন সরকারে এল তারাও জানাল যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই তারা ক্ষমতা দখল করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধাঁচার ভেতরের প্রকৃতি, প্রকরণ ও তার নৈতিকতা নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতেই পারে। টমাস জেফারসনের একসময়ের উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ৫১ শতাংশ মানুষ ৪৯ শতাংশ মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে অনায়াসে গণতন্ত্রে শাসন চালাতে পারে। একবিংশ শতাব্দীর ভারতে আমরা বিষয়টাকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিতে পারি। একটি শিক্ষিত সমাজে কেউই কারুর অধিকার হরণ করে নিতে পারে না। তাসত্ত্বেও পদ্ধতি অনুযায়ী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চালু ব্যবস্থায় এটি '৫১ শতাংশেরই নির্বাচন'। দেশব্যাপী বিরোধীরা যে অপবিত্র ও আদর্শহীন জোট গড়ার চেষ্টায় মেতেছে তাতে ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপির পক্ষে একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছে জনতাকে গিয়ে বলার যে, তোমরা আমাদের ৫১ শতাংশ জনাদেশ দাও।

আমি ওপরের প্যারাগ্রাফের মধ্যে দিয়ে কর্ণাটক নির্বাচনের ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ৪ বছর শাসন পরিচালনা করার পর নির্বাচন থেকে মাত্র ১ বছর দূরে দাঁড়িয়ে শাসক দল কিন্তু কিছুতেই এই মহাগুরুত্বপূর্ণ শতাংশকে এড়িয়ে যাওয়ার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে না। বিগত চার বছরে আমরা দেশবাসীকে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন উপহার দিয়েছি। দেশের অর্থনীতি অত্যন্ত সঠিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে বিরোধীদের শত বিরোধিতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ২০১৮ সালে অর্থনৈতিক বিশ্বের বিচারকদের মানদণ্ডে জিডিপির বৃদ্ধি দাঁড়াবে ৭.৫ শতাংশ যা এশিয়ার মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করবে। ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুকের রিপোর্ট অনুযায়ী আগামী বহু বছর ধরে ভারতই থাকবে বিশ্বের সব থেকে দ্রুত গতিতে বেড়ে চলা অর্থনীতি। এই সূত্রে তাঁরা জানাচ্ছেন ভারতে ২০১৮-তে সম্ভাব্য বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ২০১৭ সালের ৬.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭.৪ শতাংশ । অনুরূপভাবে '২০১৯ সালের অর্থবর্ষে তা ৭.৮ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলবে। এর মূল পরিচালিকা শক্তি হবে ভোগ্যপণ্যের বিক্রির ক্ষেত্রে বিপুল বৃদ্ধি। ইতিমধ্যে প্রায় মুছে যাবে ক্ষণস্থায়ী বিমুদ্রীকরণের অসুবিধে ও সারা দেশে একটি কর ব্যবস্থা প্রচলন করার প্রয়াস হিসেবে জিএসটির পরিপূর্ণ সদর্থক প্রভাব পড়বে অর্থনীতিতে। মধ্যবর্তী সময়ে কাঠামোগত সংস্কারগুলি ক্রমাগত লাগু হতে থাকার ফলে ক্রমশ উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধি ঘটতে থাকবে। বেসরকারি পুঁজিও

> "বিধানসভার নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে শক্তপোক্ত স্থানীয় নেতার খুবই প্রয়োজন। আর এই বলিষ্ঠ স্থানীয় নেতৃত্বকেই বাড়তি মদত জোগাবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বিভিন্ন রাজ্যের প্রাদেশিক নেতৃত্বকেই আগুয়ান হয়ে বাড়তি চাপ দিতে হবে। এর সুফল আমরা আগে পেয়েছি উত্তর-পূর্বের ক্ষেত্রে।"

লগ্নি করতে উৎসাহিত হবে।' এগুলি সবই গতমাসের আই এম এফ প্রকাশিত মাসিক মিডিয়া রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত।

অন্যদিকে চার বছর পার হবার পরও প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা রয়েছে তুঙ্গে। এটি মনগড়া কথা নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থার করা সমীক্ষার মাধ্যমে এই তথ্য উঠে আসা শুধু নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নির্বাচনী জনাদেশগুলি তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের সময় তিনি ৭০টি সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন, সঙ্গে বেশ কিছু রোড শো-ও করেন। এর ফল কী হয়েছিল তা সকলেরই জানা। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর তিনটি সভা করা নির্ধারিত থাকলেও স্থানীয় নেতৃত্বের দাবিতে তিনি চারটি সভা করতে বাধ্য হন। এর ফলাফলও জনসমক্ষে প্রকাশিত। আমরা ৬০ সদস্যের বিধানসভায় ৩৫টি আসন আশা করেছিলাম, পেয়ে গেলাম ৪৫ টি। মুছে গেল সিপিএম। কর্ণাটকের ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী ২১টি সভা করেছিলেন। প্রথমে কিন্তু তাঁর কেবল ১২টি সভা করার কথা ছিল। সকলের আগ্রহ ও জনতার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই সভাগুলি জনসমুদ্রের রূপ নেওয়ায় তাঁকে বাড়তি সভার অনুরোধ করা হয়। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে তাঁর এই সভাগুলির প্রত্যক্ষ অভিঘাতেই বিজেপি অন্য সব দলকে পেছনে ফেলে সাফল্যের দোরগোড়ায় চলে যায়। দেশের প্রত্যেকটি নির্বাচনেই প্রধানমন্ত্রী দলের প্রচেষ্টার ওপর একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বাড়তি পালিশ দিয়ে দেন।

২০১৩ সালে প্রাপ্ত ৪০টি আসন থেকে ২০১৮-তে ১০৪টি আসন দখল করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়াতে দলের কার্যকর্তা, সমর্থক সকলের মধ্যেই একটা আনন্দের হাওয়া উঠেছিল। পরিতৃপ্তির একটা আবহ তৈরি হলেও ফলাফল চূড়ান্ত পরিণতির শীর্ষ ছুঁতে পারল না। অনুমান মতো কর্ণাটকে একটি বিজেপি পরিচালিত সরকার গঠিত হলো না। ভারতীয় জনতা পার্টি আধ ডজন আসন কম পেয়ে গেল। হঠাৎ মিলিত হয়ে সমস্ত আলো নিয়ে গেল দু'টি হেরো দল। কংগ্রেস দল নির্বাচনে ৪৫টি আসন খুইয়েছিল আর জনতা দল (সেকুলার) হারিয়েছিল ১৮০টি আসন। কর্ণাটক আবার কিন্তু কংগ্রেসের দলের একটি বিশেষ ছিদ্রকে নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেল নির্বাচনী সাফল্যের নিরিখে, ভোট জোটানোর ক্ষেত্রে তাদের নেতা রাহুল গান্ধী আবার ব্যর্থ হলেন। অন্যদিকে ঠিক পঞ্জাবের মতো এখানেও প্রাদেশিক নেতারাই কংগ্রেসের আসন জয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা মুখ রক্ষা করেছেন। এখানেই বিজেপির জন্য কিছু অনুধাবনের বিষয় রয়ে গেছে। বিধানসভার নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে শক্তপোক্ত স্থানীয় নেতার খুবই প্রয়োজন। আর এই বলিষ্ঠ স্থানীয় নেতৃত্বকেই বাড়তি মদত জোগাবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বিভিন্ন রাজ্যের প্রাদেশিক নেতৃত্বকেই আগুয়ান হয়ে বাড়তি চাপ দিতে হবে। এর সুফল আমরা আগে পেয়েছি উত্তর-পূর্বের ক্ষেত্রে।

যাই হোক, কর্ণাটকে আমরা একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি। ১৯৯৬ সালে দেবেগৌড়া মাত্র ৪৬ জন দলীয় সাংসদ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ২০১৮ সালে তাঁর ছেলে কুমারস্বামী মাত্র ৩৭ জন বিধায়ক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বনে গেলেন। কংগ্রেস একটি নির্বিকার ও নৃশংস দল। দেবেগৌড়াকে তারা মাত্র ১১ মাস প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সহ্য করেছিল। সকলে মিলে আশা করা যেতে পারে তারা হয়তো বেঙ্গালুরুর বিধানসৌধে রাজ করতে কুমারস্বামীকে আর একটু বেশি সময় দেবে।

(লেখক বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক)

শোকসংবাদ

কলকাতা বিধাননগর মণ্ডলের কল্যাণ আশ্রমের সভাপতি হৃষিকেশ কর গত ২০ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি স্ত্রী, পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর বীরভূম জেলার আয়াস বেলেবাড়ির বাসিন্দা বীরভূম জেলা সম্পর্ক প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণপদ পালের বাবা শিবশঙ্কর পাল গত ১৫ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কোচবিহার নগরের স্বয়ংসেবক, বিশ্বহিন্দু পরিষদের জেলা সহ-সম্পাদক সুকুমার ভট্টাচার্যের মাতৃদেবী অনু ভট্টাচার্য গত ২৯ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের পূর্বতন প্রান্ত শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ ও সহ-প্রান্ত কার্যবাহ শ্রীমন্ত চন্দ্রের মাতৃদেবী আঙুরবালা চন্দ্র গত ৩১ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি ২ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের কাছে তিনি ছিলেন মাতৃসমা।

মঙ্গলনিধি

গত ৯ মে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারুইপুর জেলার সোনারপুর খণ্ড ব্যবস্থা প্রমুখ সত্যব্রত মণ্ডলের বাবা ফণীন্দ্রকুমার মণ্ডল তাঁর পুত্রের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন জেলা সেবা প্রমুখ মহাদেব মণ্ডলের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ২২ মে সঙ্ঘের সুন্দরবন জেলার জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ দীপক নস্কর তাঁর পুত্র শান্তনু নস্করের দ্বাদশবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন সমাজ সেবা ভারতীর প্রাদেশিক কার্যকরী সভাপতি শিবদাস বিশ্বাসের হাতে। অনুষ্ঠানে জেলা সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালী-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

রম্যরচনা

আদুর বাদুড় চালতা বাদুড়
কলা বাদুড়ের বে'
বাদুড় মায়ের কোলে খুকু
নীপা এসেছে।

* * *

● বাবা— এবার কিন্তু পরীক্ষায় প্রত্যেকটা বিষয়ে নাইনটি পারসেন্ট পেতে হবে।

● ছেলে—না, না বাবা। আমি তো এবার প্রতিটা সাবজেক্টে হান্ড্রেড পারসেন্ট আনব।

● বাবা—ফাজলামি করিস না।

● ছেলে—শুরুটা কে করেছিল?

* * *

● এক ভদ্রলোক মৃত্যুর পর স্বর্গে এসেছেন। দেখেন, যমরাজের টেবিলের ওপর একটি বিশাল টেবিল ঘড়ি। ঘড়ি দেখে অবাক হয়ে ভদ্রলোক যমরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন— আচ্ছা, এই ঘড়ির বৈশিষ্ট্য কী? যমরাজ বললেন— পৃথিবীতে কেউ মিথ্যা কথা বললেই এই ঘড়িতে একবার অ্যালার্ম বেজে ওঠে। বলতে বলতেই ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে উঠল। সে অ্যালার্ম আর থামতেই চায় না। ভদ্রলোক অবাক হয়ে যমরাজকে বললেন— আপনি তো বললেন, একবার অ্যালার্ম বাজবে। এতো দেখেছি বেজেই চলেছে। থামতে চাইছে না। অনেকে একসঙ্গে মিথ্যা কথা বলছে বুঝি?

যমরাজ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন— না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এখন ভাষণ দিচ্ছেন।

উবাচ

"আগামী লোকসভা ভোটে বিহারে যে ভোট পাওয়া যাবে তা নরেন্দ্র মোদীর নাম আর নীতীশ কুমারের কাজের জোরেই। এতে দ্বিমত থাকার কথা নয়।"

বিহারে এনডিএ-র আসন রফা প্রসঙ্গে

সুশীল মোদী
বিজেপি নেতা

"পুরুলিয়াকে বিরোধীশূন্য করার কথা বলেছিলেন অভিষেক। তারপরই খুন হয় আমাদের দু'জন কর্মী।"

পুরুলিয়ায় বিজেপি কর্মী খুন প্রসঙ্গে

কৈলাস বিজয়বর্গীয়
বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক

"রাজ্যপাল হলেন রাজ্যের পথপ্রদর্শক। কেন্দ্র-রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী ব্যক্তিও।"

রাষ্ট্রপতি ভবনে রাজ্যপালদের সম্মেলনে বক্তব্য

রামনাথ কোবিন্দ
ভারতের রাষ্ট্রপতি

"জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গিরা একের পর এক হামলা চালাচ্ছে। সরকার এখন সংঘর্ষ বিরতি তুলে নেওয়ার কথা ভাবছে।"

রমজান মাসে সংঘর্ষ বিরতির মধ্যেও লাগাতার জঙ্গি হামলা প্রসঙ্গে

হংসরাজ গঙ্গারাম আহির
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

"স্বাধীনতা সংগ্রামে জনজাতি ও বনবাসী সম্প্রদায়ের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সেই ঐতিহাসিক ভূমিকা স্মরণে রেখে শীঘ্রই আমরা একটি ডিজিটাল সংগ্রহশালা গড়ে তুলব।"

স্বাধীনতা সংগ্রামে জনজাতি সমাজের ভূমিকা প্রসঙ্গে

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

নামে মাত্রই মুখ্যমন্ত্রী, বুঝিয়ে দিয়েছেন কুমারস্বামী

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর পদে শপথ নেওয়ার পর এক সপ্তাহও কাটেনি সত্য কথাটি কবুল করে ফেললেন এইচ ডি কুমারস্বামী। বললেন, বিধানসভা নির্বাচনে কর্ণাটকের জনগণ তাঁকে প্রত্যাখ্যানই করেছেন। জনতার রায়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হননি। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন কংগ্রেসের দয়ায়। কুমারস্বামীর এই মন্তব্যের নিহিতার্থ হলো— জনগণের রায়কে কার্যত উপেক্ষা করেই কংগ্রেস এবং জেডিএস জোট কর্ণাটকে ক্ষমতা দখল করেছে। ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে এমন নজির বোধকরি আর একটিও মিলবে না যেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নিজে স্বীকার করছেন, জনতার রায়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হননি। কুমারস্বামী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের কিছুদিন পরেই ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে কর্ণাটক। প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত এই সমস্যার সামনে কার্যতই অসহায় কুমারস্বামী। কেননা, তিনি এবং তাঁর উপমুখ্যমন্ত্রী ব্যতীত আর কেউ এখনও পর্যন্ত শপথ গ্রহণ করে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নেননি। কারণ, যাঁর দয়ায় কুমারস্বামী মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন, সেই রাহুল গান্ধী আপাতত বিদেশে। তিনি দেশে না ফিরলে কুমারস্বামী সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না কাকে কাকে মন্ত্রীসভায় নেবেন। এমতাবস্থায় রাজ্যের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য কুমারস্বামীকে সরকারি আমলাদের উপর ভরসা করতে হচ্ছে। কর্ণাটকে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অবশ্য কুমারস্বামীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু রাহুল গান্ধী? যার জন্য এখনও কর্ণাটকে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভাই গঠিত হলো না, তিনি? তাঁর এসব নিয়ে হেলদোল নেই।

পিছনের দরজা দিয়ে কর্ণাটকের জনগণকে তঞ্চকতা করে ক্ষমতায় এসেছেন। কাজেই বানভাসি কর্ণাটকের জনতার প্রতি তাঁর কোনও দায়বদ্ধতা নেই। ফলে কুমারস্বামী শপথ নেওয়ার সাতদিনের ভিতর এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে--- কংগ্রেস-জেডিএস-এর এই জোট সরকারের আয়ু কতদিনের?

কর্ণাটকে জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত দুটি দল কংগ্রেস এবং জেডি(এস) শুধুমাত্র বিজেপিকে আটকাতে হবে বলে তড়িঘড়ি জোট বেঁধে সরকার গড়ে ফেলায় আনন্দিত

> একক ভাবে কর্ণাটকে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি কংগ্রেস, তার সমস্ত নির্বাচনী কৌশলই কার্যত ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতিও আস্থা প্রদর্শন করেননি কর্ণাটকের মানুষ— তবু কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা আনন্দিত হচ্ছে। আনন্দিত হচ্ছে— কারণ, তড়িঘড়ি একটি জোট খাড়া করে বিজেপিকে আটকানো গেছে।

হয়েছেন তাবৎ বিজেপি- বিরোধীরা। কুমারস্বামীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এঁরা বিজেপি-বিরোধী জোট গড়ার একটি মহড়াও দিয়েছেন। তবে, সে জোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ফেডারেল ফ্রন্ট হবে, না, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ইউপিএ— তা নিয়ে যথেষ্ট ধন্দ রয়েছে। সে ধন্দ মিটিয়ে মোদী বিরোধীরা আদৌ কোনও জোটের জন্ম শেষ পর্যন্ত দিতে পারবেন কিনা— তা ভবিষ্যতই বলবে। তবে, এভাবে বিজেপিকে আটকে দিতে পেরে রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস যারপর-নাই আহ্লাদিত হয়েছে। কিন্তু স্থির বুদ্ধিতে যদি একটু বিচার করা যায়, তাহলে এরকম খটকাও মনে দেখা দেবে যে, কর্ণাটকে ভোটের ফলাফলে কংগ্রেসের কি সত্যিই উল্লসিত হওয়ার মতো কারণ ঘটেছে? জেডি(এস)-এর সঙ্গে নির্বাচন-পরবর্তী জোট করে সরকার গড়ায় কংগ্রেস সম্পর্কে এই প্রশ্নটিই উঠবে— নির্বাচনে কংগ্রেস তাহলে ঠিক কার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। কর্ণাটকে নির্বাচনের ময়দানে কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিপক্ষ ছিল এই জেডি(এস)। অনেকগুলি আসনে জেডি(এস)-এর সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াইও হয়েছিল। এমনকী, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী নির্বাচনী প্রচারে জেডি(এস)-কে বিজেপির বি-টিম আখ্যা দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত সেই বিজেপির বি টিমের সঙ্গেই যদি সরকার গড়তে হয়, তাহলে কর্ণাটকের নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে কী জবাব দেবেন রাহুল গান্ধী।

কর্ণাটক নির্বাচনের পর কংগ্রেস শুধু হারেনি, তার আসন সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। সরকার হাতছাড়া হয়েছে (যদিও এখন আবার কৌশল করে পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে মন্ত্রীসভায়)। কর্ণাটকে

ভোটে জিততে যা যা কৌশল রাহুল গান্ধী করেছিলেন— সব কৌশলই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। গুজরাটের ভোটে হার্দিক প্যাটেল-জিগ্নেশ মেভানিদের সঙ্গী করে রাহুল যেমন জাতপাতের ঘৃণ্য রাজনীতি খেলতে গিয়েছিলেন এবং ব্যর্থ হয়েছিলেন— কর্ণাটকেও তাই হয়েছে। কর্ণাটকে বিদায়ী কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়াকে দিয়ে হিন্দু লিঙ্গায়ত ভোট বিভাজন করে ভোটে জেতার ঘৃণ্য প্রয়াস করেছিলেন রাহুল। ভোটের আগে সিদ্দারামাইয়া লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু ঘোষণা করে হিন্দু ভোটে ফাটল ধরানোর চেষ্টাও করেছিলেন। ভোটের ফল বেরলে দেখা গেল, কংগ্রেসের এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা কর্ণাটকের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছেন। লিঙ্গায়তরা ভোট দিয়েছে বিজেপিকেই, কংগ্রেসকে নয়। কর্ণাটকের নির্বাচনে বিজেপিকে দলিত বিরোধী আখ্যা দিয়ে দলিত আবেগকেও নিজের দিকে টানতে কম চেষ্টা রাহুল করেননি। সেখানেও রাহুল ব্যর্থ হয়েছেন। কর্ণাটকের ফলাফলে দেখা গিয়েছে, দলিত ভোটেরও একটি বড় অংশ বিজেপির পক্ষে গিয়েছে।

একক ভাবে কর্ণাটকে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি কংগ্রেস, তার সমস্ত নির্বাচনী কৌশলই কার্যত ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতিও আস্থা প্রদর্শন করেননি কর্ণাটকের মানুষ— তবু কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা আনন্দিত হচ্ছে। আনন্দিত হচ্ছে— কারণ, তড়িঘড়ি একটি জোট খাড়া করে বিজেপিকে আটকানো গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে— কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের এই আনন্দ ক্ষণিকের আনন্দ নয় তো? কুমারস্বামী ইতিমধ্যেই যেভাবে বলেছেন তিনি কংগ্রেসের দয়ায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তাতেই বোঝা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসনটি তাঁর কাছে কণ্টকপূর্ণ বলেই বোধ হচ্ছে। কুমারস্বামীর পিতা, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়াও বলেছেন— মুখ্যমন্ত্রীর পদটি জোর করেই তাঁর দলকে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। পিতাপুত্র উভয়ের কথাতেই পরিষ্কার— কংগ্রেসের সমর্থনে তাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের অস্বস্তি বেড়েছে বই কমেনি। মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামীর কথায় আরও একটি ইঙ্গিতও স্পষ্ট যে, কংগ্রেস তাঁকে যেমন নাচাবে, তাঁকে তেমনিই নাচতে হবে। তেমনই যে নাচতে হবে— সে ইঙ্গিত এখনই মিলেছে। মন্ত্রীসভায় কাদের নেওয়া হবে— রাহুল গান্ধীর কাছ থেকে সে নির্দেশ পাওয়ার জন্য এখন হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হচ্ছে কুমারস্বামীকে। তদুপরি, কুমারস্বামীকে মন্ত্রীসভায় কংগ্রেসের জন্য বেশি দপ্তর ছাড়তে হবে। ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির জন্য কংগ্রেস দাবি জানিয়ে বসেছে। সে দাবি কতটা কুমারস্বামী মানতে পারবেন— তা ক'দিন পরেই বোঝা যাবে।

সম্পূর্ণ মন্ত্রীসভা গঠন হওয়ার আগেই ছবিটা যদি এই হয়— তাহলে আগামী দিনগুলিতে কুমারস্বামী-কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা কেমন গতিতে চলবে— তা সহজেই অনুমেয়। শুরুটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কুমারস্বামী নামেমাত্রই মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন— প্রকৃত রাশটা থাকবে কংগ্রেসের হাতে। কংগ্রেস কুমারস্বামীকে তাদের মর্জিমতো পরিচালনা করবে। আর সংশয়টা এখানেই। কুমারস্বামী কতদিন কংগ্রেসের হুকুমের দাস হয়ে থাকতে চাইবেন?

মনে রাখতে হবে, সরকার ফেলে দেওয়ার একটি সুনাম কংগ্রেসের আছে। কুমারস্বামী এবং তাঁর দল জেডি(এস) এর আগে কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার চালাতে গিয়ে দেখেছেন— কংগ্রেস খুব নির্ভরযোগ্য শরিক নয়। নিজের স্বার্থ ফুরালেই কংগ্রেস পিছনে ছুরিকাঘাত করে। রাজনৈতিক মধুচন্দ্রিমার প্রথম ধাপটা কেটে গেলেই কুমারস্বামী যখন স্বাধীন হতে চাইবেন— তখনই কংগ্রেসের আঘাত আসবে। স্রেফ স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি জোটের এছাড়া আর কোনও ভবিষ্যৎ হয় না। ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে এইসব স্বার্থসর্বস্ব জোটের করুণ পরিসমাপ্তি বহুবার লেখা হয়েছে।

কুমারস্বামী এবং কংগ্রেস হয়তো ভাবতে পারেন— কর্ণাটকে তাঁরা লাভবান হলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লাভবান হলেন কি? হ্যাঁ, তাৎক্ষণিকভাবে একটি লাভ তাঁদের হয়েছে— তা হলো, বিজেপিকে সাময়িকভাবে ক্ষমতার বাইরে রেখে তারা সরকারটি গড়ে ফেলতে পেরেছেন। কিন্তু যেভাবে কর্ণাটকের জনমতকে উপেক্ষা করে কুমারস্বামী ক্ষমতায় বসলেন, তাতে তাঁর রাজনৈতিক ভাবমূর্তি কর্ণাটকের মানুষের কাছে উজ্জ্বল হলো কিনা— সেটাও ভাববার বিষয়। এর জন্য ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে যদি কুমারস্বামীকে খেসারত দিতে হয়— তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তার চেয়েও বড় কথা কুমারস্বামীর সরকারটিকে চলতে হবে একটি ট্রাপিজের উপর দিয়ে। পতনের ভয় সবসময়ই তাড়া করে বেড়াবে কুমারস্বামী এবং কংগ্রেসকে।

এদের বিপরীতে রয়েছে বিজেপি। একথা ঠিক, বিজেপিকে সরকার গড়তে গেলে বিরোধী শিবির থেকে কিছু বিধায়ককে ভাঙাতেই হতো। তাতে বিজেপি হয়তো সরকার গড়তে পারত, কিন্তু নানাবিধ অপ্রীতিকর প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হতো তাকে। সেদিক দিয়ে নরেন্দ্র মোদীর পরামর্শে আস্থা ভোটের দিনই ইয়েদুরাপ্পার পদত্যাগ একটি সার্থক রাজনৈতিক চাল হয়েছে। কর্ণাটক বিধানসভায় বিজেপির সদস্য সংখ্যা ১০৪। সরকারের ঘাড়ের ওপর সবসময়ই নিঃশ্বাস ফেলার ক্ষমতা তার রয়েছে। তার ওপর কুমারস্বামীর সরকার যদি মেয়াদ পূর্ণ করতে না পারে— যার সম্ভাবনাই বেশি— তবে পরবর্তী নির্বাচনে বিজেপির একক গরিষ্ঠতা লাভ করা সহজ হয়ে দাঁড়াবে। কর্ণাটকে বিজেপির এখন হারানোর কিছুই নেই। বরং জয় করার জন্য অনেক রাস্তা খোলা আছে তার সামনে। কুমারস্বামী আর কংগ্রেসের সামনে কিন্তু ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কাটি রয়েছে। ■

তর্কবাগীশ সবজান্তা বামপন্থী এবং মূর্খ মাঝির গল্প...

স্বনাম গুপ্ত

একটা বামপন্থী গ্রুপে বামপন্থীদের সঙ্গে জোর তর্ক-বিতর্ক হলো। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এই লেখা। এই অভিজ্ঞতা কম বেশি সবারই হয়তো আছে। এই বামপন্থীরা সত্যিই প্রকৃতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি। চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও এরা দেখতে তো চাইবেই না, বরং অদ্ভুত সব মার্কসীয় তত্ত্ব খাড়া করে বাস্তব দেখাটাকেই অস্বীকার করবে।

অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই, দুটি সম্প্রদায়ের মানসিকতার একটা পরিষ্কার পার্থক্য আছে, যেটা আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট, শিক্ষার হার বা কোনও কিছু দিয়ে কোনওমতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এরা এটা স্বীকারই করবে না। যদি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে তুলনা করা হয়, দেখা যাবে সুস্পষ্ট পার্থক্য। দেখা যাবে একজন তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক শিক্ষিত প্রগতিশীল আলোকপ্রাপ্ত মুসলমান একজন সাধারণ হিন্দুর চেয়েও বেশি সাম্প্রদায়িক হয়। একটি হিন্দু-অধ্যুষিত এবং অপরটি মুসলমান-অধ্যুষিত পাশাপাশি দুটি গ্রাম, আর্থ সামাজিক অবস্থাও এক। অথচ একটি গ্রামে আইনের শাসন চলে না, প্রশাসনকেও সমঝে চলতে হয়। মুখে বড় বড় কথা বলা, 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই' বলা সেকুলার দাদারা সেখানে পোস্টিং নিতে চান না। খুব সস্তায় জমি বা ফ্ল্যাট পেলেও কিন্তু সেখানে যাবেন না। যদিও সম্পূর্ণ হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকায় একটি মুসলমান পরিবারের থাকতে কিন্তু কোনও অসুবিধা হয় না। কারণটা কী? সবাই জানে, কিন্তু স্বীকার করবে না কিছুতেই।

যেমন ধরুন, শ্রীজাতর পাশে তো এদেশের তাবৎ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী দাঁড়িয়েছেন, এমনকী অনুকূল ঠাকুরের ধর্মভীরু শিষ্য শীর্ষেন্দুর মতো লেখকও। বাংলাদেশে তসলিমা বা হুমায়ুন আজাদদের পাশে হুমায়ুন আহমেদরা দাঁড়িয়েছিলেন কি? বরং হুমায়ুন আহমেদদের বক্তব্য ছিল এরকম লিখলে তো এরকমই হবে। বলুন তো, আর্থ সামাজিক অবস্থা বা শিক্ষায় এরা মুসলমান সমাজের ঠিক কোন শ্রেণীতে পড়েন? এই যদি হয় মুসলমান প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মানসিকতা, সাধারণ মুসলমানদের মানসিকতাটা কী? আসলে বাস্তবটা হলো হাতেগোনা কয়েকজন মুসলমান পদবিধারী নাস্তিক (ইসলামি পরিভাষায় 'মুরতাদ') ছাড়া হাজার চেষ্টা করলেও এদের প্রগতিশীলতা, অসাম্প্রদায়িকতা একটা লেভেলের উপর উঠবেই না।

এবার ধরুন, পাশাপাশি কয়েকটি দেশের তুলনা টানলাম। হিন্দু প্রধান নেপালও কিছুদিন আগে হিন্দু রাষ্ট্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়ে গেছে, সেদেশের সাধারণ মানুষ তাতে বাধা দেয়নি। ঠিক এই ভাবে মুসলমান প্রধান পাকিস্তান কোনওদিন ইসলামিক রাষ্ট্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়ে যাবে— আমরা কি কখনও কল্পনাও করতে পারি? কেন পারি না? এবার বামপন্থীরা বেশ উজ্জীবিত হয়ে বলে উঠবেন, এটা তো নেপালের কমিউনিস্টদের কৃতিত্ব। আরে, আমিও তো সেকথাই বলছি— মুসলমান প্রধান বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে কমিউনিস্টরা কেন সেখানকার মানুষকে এইভাবে উজ্জীবিত করতে পারে না? যে বামপন্থা একদা হিন্দু রাষ্ট্র নেপালের হিন্দুদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে ধর্ম ভুলিয়ে দেয়, সেই একই বামপন্থায় উদ্বুদ্ধ হয়েই বাম দুর্গ কেরল কেন পরিণত হয় জিহাদি ঘাঁটিতে, সেই একই বামপন্থা সেখানে কেন মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করে মধ্যযুগীয় শরিয়তের সমর্থনে সাড়া জাগানো মিছিল করতে?

যাই হোক, ওপারের বিপ্লবের জন্য উপযুক্ত উর্বর ভূমিতে কেন বিপ্লবের চাষাবাদ হলো না? সব আগুনখেকো বিপ্লবীদের কেন এপারেই আসতে হলো? ওপারে কি প্রলেতারিয়েত কম ছিল? দাড়ি-লুঙ্গিধারী শ্রমজীবী মানুষ, খেটে খাওয়া শোষিত মানুষ, 'হ্যাভ নটস্' তো অনেক ছিল। তাহলে ওপারের কমরেডরা ওই দাড়ি-লুঙ্গিধারী হ্যাভ নটস্‌দের নিয়ে বিপ্লব করল না কেন? বাংলাদেশ বা পাকিস্তান-সহ বিভিন্ন মুসলমান প্রধান দেশগুলিতে কমিউনিস্টদের তেমন অস্তিত্ব নেই কেন?

কী বললেন, বাংলাদেশে বামপন্থীরা নেই? এবার এনারা এঁড়ে তর্ক জুড়ে দেবে। কথা শুনে মনে হবে যেন বামেরা সেদেশের প্রধান বিরোধী দল, সেদেশের প্রতিনিয়ত অকথ্য সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে শাহবাগ স্কোয়ারে দল বেঁধে কাছিম আর শূয়োর খেয়ে প্রতিবাদ জানায়, জঙ্গি আন্দোলন করে, পদকটদক যার যা ছিল সব ফিরিয়ে দিয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধীনতার দাবি জানায় জোর গলায়। মৌলবাদের বিরুদ্ধে সদা তৎপর! এই সুবিধাবাদী ক্ষমতালোভী বামপন্থীরা যে ক্ষমতার স্বাদ পেতে সেদেশে জামাতের মতো কট্টর ইসলামিক মৌলবাদী দলের সঙ্গে জোট করেছিল— সেটা কিন্তু বেমালুম চেপে যাবে। টিমটিমে যেটা আছে, সেটাও তো ইসলামাইজড বামপন্থা, সেখানকার গভীর ইসলাম বিশ্বাসী বামপন্থী নেতারা ধর্মপ্রাণ

মুমিন হিসেবে হজ-টজ করে। যে দেশের বামপন্থার কিংবদন্তি নায়ক মৌলানা ভাসানির মতো মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক মানসিকতার মানুষ, সেখানকার বামপন্থা যে আসলে কী, সহজেই অনুমেয়। সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির সদর দপ্তরে আছে নমাজ আদায়ের সুব্যবস্থা। মুসলমান প্রধান দেশে যে এটুকু আছে, সেটা নিয়েই এদের কত গর্ব। স্বাভাবিক!

যাই হোক, যা বলছিলাম নেপালের কথা। সাধারণ হিন্দু আর সাধারণ মুসলমানদের মানসিকতা নাকি একই। মুসলমান প্রধান বাংলাদেশে তাহলে নেপালের উল্টোটা কী করে হলো? ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নিয়েও বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দাবি মেনে পরে ইসলাম হয়ে গেছে। কেউ বাধা দিয়েছিল কি? বরং সাধারণ মুসলমান জনতা খুশিতে ফেটে পড়েছিল। বাংলাদেশে মৌলবাদী জামাতের ভোট মাত্র দুই শতাংশ। অথচ দেশটাকে আবার ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণার একটা চেষ্টা করেও পিছিয়ে আসতে হয় বাকি এত বিশাল সংখ্যক 'অসাম্প্রদায়িক সাধারণ মুসলমান'-এর প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে। ভাবুন তো, এই হিন্দু সংখ্যাগুরু ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করতে গেলে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের বড় অংশই কি বিক্ষোভে ফেটে পড়বে না?

এবারও নিজেদের দিকে ঝোল টানার একটা বৃথা চেষ্টা হবে— আসলে এদেশের মানুষ যে অনেক বেশি সচেতন, এর কৃতিত্ব এদেশে সক্রিয় বামপন্থী চিন্তাধারার। আরে, আমারও তো এটাই প্রশ্ন— ওসব দেশে কেন বামপন্থা সক্রিয় হতে পারে না? আর যদি সত্যিই সক্রিয়তা একইরকম হয়, দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণটা তাহলে কী? নাকি, মুসলমান প্রধান দেশে টিকে থাকতে গিয়ে বামপন্থারও ইসলামিকরণ হয়ে গেছে? নাহলে জামাতের মতো কট্টর মৌলবাদী দলের সঙ্গে জোট হয় কীভাবে? একই দেশ ভেঙে সৃষ্টি হওয়া আমাদের প্রতিবেশী মুসলমান প্রধান দুটি দেশে মৌলবাদের এত রমরমা কেন, এই সোজা প্রশ্নের সোজা কোনও উত্তর তো পাবেনই না, এই বাস্তবটাকে স্বীকার পর্যন্ত করবে না এরা।

নাসিরনগর, মালোপাড়া, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর-সহ সেদেশের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু বসতিগুলিতে যে উন্মত্ত মুসলমান জনতা হায়েনার মতো দল বেঁধে হামলে পড়েছিল, এরা কি সাধারণ মুসলমান ছিল না? পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের উপর প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে কারা অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে? এমনকী এদেশের ক্যানিং দেগঙ্গা, কালিয়াচক, ধুলাগড় বা বাদুড়িয়ায়? নাসিরনগরের কথা শুনে আবার এঁদের কেউ কেউ বলে উঠবেন, সেখানে কিন্তু দুজন মুসলমান হিন্দুদের বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন। ভাবুন অবস্থা, ধর্মোন্মাদ মুসলমানের সংখ্যা হাজার হাজার, আর বিপরীতে মাত্র দুজন— অনুপাতটা দেখুন। কোনটা সহি ইসলাম? আসলে যে মাপকাঠি দিয়ে মেপে কোনও কোনও হিন্দুদের মৌলবাদী আখ্যা দেওয়া হয়, সেই মাপকাঠিতে মাপলে নব্বই শতাংশ মুসলমানই কি মৌলবাদী নয়?

বামেরা এবার উপায়ান্তর না দেখে বেশ গম্ভীর হয়ে বলবে— আসলে মানুষে-মানুষে পার্থক্য নেই, ওসব দেশে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারটাই নেই, পরিবেশ নেই। কিন্তু আমারও তো এটাই প্রশ্ন— যে-কোনও মুসলমান প্রধান দেশে কেন কোনও স্থিতিশীলতা নেই, গণতান্ত্রিক পরিবেশ কেন নেই বা থাকলেও কেন মজবুত নয়? রক্তপাত, হানাহানি, অভ্যুত্থান, এ-ওকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল— এসবই লেগে আছে, তেল এবং আমেরিকার স্বার্থ বিহীন দেশেও? এই ভারতবর্ষের মুসলমান প্রধান অংশগুলি ভেঙে ভেঙে যতগুলো আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হলো, প্রত্যেকটি ইসলামিক রাষ্ট্র। একটিও কেন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলো না? এতবার ভেঙে মুসলমানদের জন্য আলাদা মুসলমান রাষ্ট্রের জন্মের পরও হিন্দু প্রধান মূল অংশটা কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার সব দায় মাথায় নিয়ে রয়ে গিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভবিষ্যতে যদি আবার ভাঙে, সেটাও হবে ধর্মীয় রাষ্ট্র। হিন্দু প্রধান মূল অংশটা কি তখনও থেকে যাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়ে? কেন এমন?

কিন্তু স্বীকার করাটা যে এদের ধাতে নেই। যারা এতক্ষণ বলছিল যে একজন সাধারণ হিন্দু আর মুসলমানে কোনও পার্থক্য নেই, তারাই এবার এই পার্থক্যের কারণ হিসেবে শিক্ষাকে টেনে আনবে। কিন্তু আমারও তো একই কথা— এত স্কুল-কলেজ থাকতে এদের মধ্যে মাদ্রাসার এত প্রসার কেন। আমাদেরও তো ছিল সংস্কৃত টোল, এখন আছে কি? ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে মাদ্রাসা। মাদ্রাসাগুলির মধ্যযুগীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে যে কী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সে তো সবারই জানা। পাকিস্তানের রাজধানী খোদ ইসলামাবাদে স্কুলের চেয়ে মাদ্রাসার সংখ্যা বেশি। এই আধুনিক যুগেও এরা শিক্ষিত হওয়ার চেয়ে ধর্মীয় শিক্ষা কেন চায়, জিহাদি কেন হতে চায়? শিকড়টা কোথায়?

এই যে শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের জিহাদিদের বেশিরভাগই তো উচ্চ শিক্ষিত। মুসলমানদের এই শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় পুরো বিশ্বের মুসলমানদের দুর্দশার আসল কারণ হিসেবে আমেরিকাকে চরম শত্রু মনে করে, আবার এই এরাই প্রতিশোধের আগুনে দলে দলে সেই আমেরিকারই তৈরি আই এস-এ যোগ দিচ্ছে, যোগ দিয়ে কোরানের আয়াত ধরে ধরে মানুষ মারছে, বিধর্মী নারীদের ধর্ষণ করছে, জন্নতের লোভে নিজেকে পর্যন্ত উড়িয়ে দিচ্ছে। বোকার মতো দলে দলে আমেরিকার ফাঁদে গিয়ে পা দিচ্ছে! বড় অদ্ভুত যুক্তি! আসলে যে বিসমিল্লাতেই গলদ, সেটা এরা কেউ খুঁজতে চাইছে না। জিহাদি আক্রমণ স্থানীয় হলে রাজনীতি আর আন্তর্জাতিক হলে আমেরিকা আর তেলের দোষ। বিধর্মীদের হত্যা, ধর্ষণের কথা, সারা বিশ্বে ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ কিন্তু কোনও আসমানি কিতাবে লেখা নেই। আসলে আমরা ওই সাহেবদের বই না পড়া নেহাতই মূর্খ বলেই বুঝতে পারি না এই নাসিরনগর, রংপুর বা বাদুড়িয়া, ধুলাগড়— সবই যে আসলে আমেরিকার চক্রান্ত! হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে লড়িয়ে দিয়ে ছোরা, পাইপগান, চাপাতি এসব অস্ত্রের ব্যবসা করতে হবে না। তবে কেন জানি এদেশে হোক আর ওদেশে, সংখ্যালঘু হোক আর সংখ্যাগুরু— একটা সম্প্রদায়ই শুধু কেন জানি এগুলি করে! এরাই শুধু বোকার মতো রাজনীতির মোহরা হয়, আমেরিকার মোহরা হয়। নাইজেরিয়ার খ্রিস্টানদের কচুকাটা করা বোকোহারাম, সোমালিয়ার আল শবাব, ফিলিপিন্সের মোরো ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ছে

না। ভারতের কাশ্মীর, চীনের জিন জিয়াং বা রাশিয়ার চেচেনরাও কিন্তু শুধু স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, আলাদা ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন বা ইসলামের সঙ্গে এদের কোনও যোগাযোগই নেই।

বামপন্থীদের আরেকটা কথা শুনলে আমার খুব হাসি পায়— এদেশে এদের যেমন বামৈস্লামিক বলা হয়, বাংলাদেশেও নাকি এদের বলা হয় যে এরা হিন্দুদের পক্ষে কথা বলে। এরা মৌলবাদের প্রতিবাদ করে বলেই নাকি এদের উপর হিন্দুদের পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ আনা হয়, ঠিক যেমন এদেশে মুসলমান পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করা হয়। এই মূর্খদের কাছে জানতে ইচ্ছে করে— এদেশে তো সংখ্যাগুরু মৌলবাদের পাশাপাশি সংখ্যালঘু মৌলবাদও যে আছে শুধু নয়, আরও বেশি শক্তিশালী, বাংলাদেশে অস্তিত্ব আছে কি সংখ্যালঘু মৌলবাদের? তাহলে সেদেশে যেটুকু ছিঁটে ফোঁটা মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন হবে, সেটা তো ইসলামিক মৌলবাদের বিরুদ্ধেই হবে, যার অস্তিত্বই নেই তার বিরুদ্ধে কীভাবে হবে! আর এদেশে বেশি শক্তিশালী এবং বেশি বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও ইসলামিক মৌলবাদ বা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একেবারে নীরব থেকে একতরফা শুধু হিন্দু মৌলবাদের বিরুদ্ধে সরব হওয়াই এদের বামৈস্লামিক শব্দের যথার্থতা প্রমাণ করছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, এদেশে মুসলমানরা যা যা করছে, যেভাবে সংখ্যালঘু হয়ে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে এবং এরপরও যেভাবে এদেশের বামপন্থীরা শুধু মুসলমানদের পক্ষেই গলা ফাটাচ্ছে, বাংলাদেশের হিন্দুরাও যদি ঠিক সেই আচরণ ওদেশে করত— এই তথাকথিত বামপন্থীদের একজনকেও কি পাওয়া যেত হিন্দুদের হয়ে কথা বলার জন্য? নাকি এই এরাই নেমে পড়ত হিন্দু নিধন যজ্ঞে (মুসলমান হলে) বা এই বামপন্থীদেরই (হিন্দু হলে) সঙ্গের কমরেড মুসলমানরাই হত্যা করতো?

একটা মজার কথা এরা প্রায়ই বলে থাকে যে, এই মুহূর্তে হিন্দু মৌলবাদই নাকি দেশের প্রধান শত্রু, সঙ্গে নাকি আছে রাষ্ট্র শক্তি— তাই এখন একে রুখতেই সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু ইসলামিক মৌলবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদে যেভাবে দেশটা ছেয়ে যাচ্ছে, যেভাবে জনসংখ্যার অনুপাত পাল্টে যাচ্ছে— আমাদের ভবিষ্যত কী? হিন্দু প্রধান এই মহান ধর্মনিরপেক্ষ দেশটাই কি তখন বাংলাদেশ পাকিস্তান হয়ে ইরাক সিরিয়া হয়ে যাবে না? এরা তখন বলে— ভবিষ্যতেরটা ভবিষ্যতে চিন্তা করা যাবে, তখন ইসলামিক মৌলবাদের বিরুদ্ধেও এভাবেই লড়াই করা হবে।

কিন্তু কথা হলো, হিন্দু প্রধান দেশে তথাকথিত হিন্দু মৌলবাদের দাপাদাপির মধ্যেও যেভাবে চোখ রাঙিয়ে আঙুল উঁচিয়ে হিন্দু মৌলবাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বলা যাচ্ছে, ইসলাম কায়েম হলে সাহস হবে কি কারোর টুঁ শব্দটি করার? কোথাও হচ্ছে কি সাহস? এমনকী এখনও হিন্দু আধিপত্যে থাকা হিন্দু প্রধান এই ভারতেই?

এরা প্রত্যেকেই বিশ্বমানব। এতক্ষণে এরা আপনাকে ভিয়েতনাম, রাশিয়া, আফগানিস্তান সব দেখিয়ে আনবে। বিশ্বমানব বলে এরা সুদূর গাজার মুসলমানদের কান্না শুনতে পায়, কিন্তু ঘরের পাশের বাংলাদেশ, নিজের দেশের কাশ্মীরি পণ্ডিত বা নিজের রাজ্যের ধুলাগড় বাদুড়িয়ার হিন্দুদের কান্না এদের কর্ণ কুহরে প্রবেশাধিকার পায় না। লক্ষণীয়, কোথাও কোনও মুসলমান আক্রান্ত হলে যে প্রতিক্রিয়া এরা দেখায়, হিন্দুরা এর চেয়ে একশো গুণ বেশি আক্রান্ত হলেও এর একশো ভাগের এক ভাগ প্রতিক্রিয়াও এরা দেখায় না।

পাঠকবর্গ, এতক্ষণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করলেন, বহুবার আমাকে 'আমি তো সেকথাই বলছি' গোছের কথা বলতে হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক বারই এরা কুতর্ক করে অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক কথা টেনে এনে মূল প্রসঙ্গকে এড়িয়ে পাঁকাল মাছের মতো ঠিক পিছলে বেরিয়ে যায়।

কোনমতেই যুক্তিতে না পেরে এবার আপনাকে বিজেপি-আর এস এস বানিয়ে এরা পাল্টা বলতে থাকবে কবে কোথায় কোন বিজেপি আর এস এস কী করছে। যেন অন্য কেউ কোনও দুষ্কর্ম করেছে বললে আমার করা দুষ্কর্মটা মিথ্যে হয়ে যাবে।

এরপর শেষ পর্যন্ত একেবারে ব্যক্তি আক্রমণ— ইতর, অশিক্ষিত, ছোটোলোক! এদের ধারণা, একমাত্র বামপন্থীরাই প্রকৃত শিক্ষিত, প্রগতিশীল, আর বাকি সবাই গণ্ডমূর্খ। ওসব সাহেবদের বই আর তত্ত্ব যাদের জানা নেই, তাদের জীবনটাই যেন বৃথা।

অথচ ইতিহাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে এদের জানার বহর দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়। এইসব সর্বজ্ঞ বিভিন্ন তত্ত্ব জ্ঞানে ভরপুর বিদ্যে বোঝাই বাবু মশাইরা যদি বিদেশি সাহেবদের বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রতিবেশী অর্থাৎ তাদের তুতুভাইদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে যে আসমানি কিতাব সেই গ্রন্থগুলি একটু উল্টে পাল্টে দেখতেন। এই আধুনিক যুগেও একটা সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষ মধ্যযুগের যে গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষর মেনে চলতে চায়, সেই গ্রন্থে আদৌ বিধর্মীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বা সম্প্রীতির কথা আছে কি না, নাকি আছে শুধু ঘৃণা, বিদ্বেষ আর বশ্যতা— সেটা না জেনেই বামপন্থীরা এদের সঙ্গে নিয়ে কীভাবে সম্প্রীতি আর বৈষম্য হীন সমাজের স্বপ্নে মশগুল হয়ে যাচ্ছে— তা তারাই বলতে পারবে। নোয়াখালিতে হিন্দুদের যখন কচুকাটা করা হচ্ছিল, এদের পূর্বজরা তখন ঘরে ঘরে কৃষিবিপ্লব শেখাচ্ছিলেন। এরপর মোল্লাদের লাথি খেয়ে কুকুরের মতো পালিয়ে এসে অন্যদের সঙ্গে এদেরও ঠাঁই নিতে হয়েছিল একটা সাম্প্রদায়িক নোংরা লোকের ছিনিয়ে আনা ভূমিতে। অতীত অভিজ্ঞতা যাদের বর্তমানকে চালিত করে না, তাদের ভবিষ্যৎও অতীতের মতোই হয়।

এই বিদেশি প্রভুর এদেশি এজেন্টরা আসলে জ্ঞান পাপী। জানে সবই, বিদেশি প্রভুর নির্দেশে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সন্ত্রাসের মূল উৎসকে সযত্নে ঢেকে রাখছে। না হলে এদের বিদেশি প্রভুরা যেখানে সেই সন্ত্রাসের মূল উৎসকে চিহ্নিত করে কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছে, এরা উল্টা পথে হাঁটছেন কেন?

বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কিন্তু বাস্তবজ্ঞান শূন্য এই বামপন্থীদের দেখে আমার ওই গল্পটার কথা মনে পড়ে— ওই একই রকম বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর বিদ্যার জাহাজ কিন্তু সাঁতার না জানা ডুবতে বসা যুবক আর মূর্খ মাঝির গল্পটার কথা। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান বাঁচায়, নাকি বাস্তবজ্ঞান বা ব্যবহারিক জ্ঞান। ■

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রথম বর্ষের শিক্ষক ও ছাত্ররা।

নতুন ভারতের জন্য নতুন নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বর্তমান যুগটা হলো পেশাগত দক্ষতার যুগ। এককালে রাজনীতির মাধ্যমে দেশসেবার ভাবনা ছিল। সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষেরা রাজনীতিতে আসতেন। স্বাধীনতার পর কালক্রমে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে দুর্নীতি এসে ঢুকলো। প্রতিষ্ঠিতেরা ক্রমশ রাজনীতি থেকে সরলেন। তার জায়গায় রাজনীতিতে এসে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মানসিকতা ক্রমশ গড়ে উঠলো। স্বামী বিবেকানন্দের লক্ষ্যকে পাথেয় করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তার জন্মলগ্ন থেকেই 'মানুষ গড়া'র জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। রাজনীতির এই অবক্ষয়ের যুগে আর এস এসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ রামভাউ মহালগি প্রবোধিনী 'নেতৃত্ব' গঠনের দিকে মন দিয়েছে।

গত বছরই তাঁরা গড়ে তুলেছেন 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ ডেমোক্র্যাটিক লিডারশিপ।' এঁরা ন'মাসের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমও চালু করেছে। বিষয়— 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ইন লিডারশিপ, পলিটিক্স অ্যান্ড গভর্নেন্স।' রাজনীতিতেও কি তবে পেশাদারিত্বের ছোঁয়া? সংগঠনের ব্যাখ্যা, বিষয়টি তা নয়। আধুনিক প্রজন্ম রাজনীতিতে অবক্ষয়ের কারণে ক্রমশ যে শুধু রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তা নয়, দেশের কাজেও তাদের ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এই ইনস্টিটিউট দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাবীসম্পন্নরা রাজনৈতিক জগতে আসতে উৎসাহিত করবে, প্রথমত রাজনীতিকে কলুষ মুক্ত করা জন্য, দ্বিতীয়ত দেশসেবায় মেধাবীদের নিয়োজিত করা হবে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

প্রসঙ্গত, ১৯৮২ সালে বোম্বাই (অধুনা মুম্বই)-এ একদল কৃতী স্বয়ংসেবক মিলে গড়ে তোলেন রামভাউ মহালগি প্রবোধিনী। প্রথম থেকেই এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল গবেষণা ও শিক্ষণ-কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষিত করে তোলা। এঁদের কাজ রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বীকৃতিও পেয়েছে। রাষ্টসঙ্ঘে তাঁরা বিশেষ পরামর্শদাতা বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে স্বীকৃত। এঁদেরই প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ ডেমোক্র্যাটিক লিডারশিপ চালু হয়েছে গত বছর থেকে। নেতৃত্ব, রাজনীতি ও প্রশাসনের ওপর এদের পাঠক্রমটির তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথমত, 'নেতৃত্ব ও ম্যানেজমেন্ট', দ্বিতীয়ত, 'রাজনীতি ও গণতন্ত্র' এবং তৃতীয়ত, 'প্রশাসন ও জননীতি'। আবেদন করতে দরকার যে কোনও বিষয়ে স্নাতক হওয়া এবং এক হাজার টাকা। পুরো কোর্স ফি দু'লক্ষ পঁচিশ হাজার। আবাসিক হলে হস্টেল খরচ ৭৫ হাজার টাকা এবং সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে রাখতে হয় আরও দশ হাজার টাকা।

মহারাষ্ট্রের থানের কেশব সৃষ্টিতে প্রায় পনেরো একর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ক্যাম্পাসে রয়েছে জিমন্যাসিয়াম, ওয়াই-ফাই, গ্রন্থাগারের মতো অত্যাধুনিক ব্যবস্থা। রাজ্যসভার সাংসদ ড. বিনয় সহস্রবুদ্ধে রয়েছেন এই পাঠক্রমের মূল দায়িত্বে। এছাড়া এর অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে রয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা। গত বছর এর প্রথম বছরের পাঠ্যসূচিতে ১৪টি রাজ্যের ৩২ জন পড়ুয়া অংশ নিয়েছিলেন। এবারেও ৩০ মে শেষ হওয়া ভর্তির দিনে ৩২ সংখ্যার আসন পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আবেদনকারী ছিলেন কয়েকশো। 'নতুন ভারতের জন্য নতুন নেতৃত্ব'— এই স্লোগানকে সামনে রেখেই দেশনির্মাণে এগিয়ে এসেছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ ডেমেক্র্যাটিক লিডারশিপ।

লক্ষ্য

(১) ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনুধাবন।

(২) নেতৃত্বের মধ্যে মূল্যবোধের জাগরণ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।

(৩) রাজনীতি, জন-সম্পর্ক ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মে পেশাদারিত্ব আনা, কিন্তু দেশসেবার মনোভাবও বজায় রাখা।

ফলাফল

(১) প্রশিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সমাজ-কর্মী নির্মাণ।

(২) সরকারি স্তরে ও বেসরকারি ক্ষেত্রে— উভয় জায়গাতেই উচ্চগুণমানের প্রতিভাবান মানব-সম্পদের জোগান দেওয়া।

(৩) যুবসমাজকে সামাজিক- রাজনৈতিক ঘটনাবলির সম্পর্কে সচেতন ও সংবেদনশীল করে তোলা। ▮

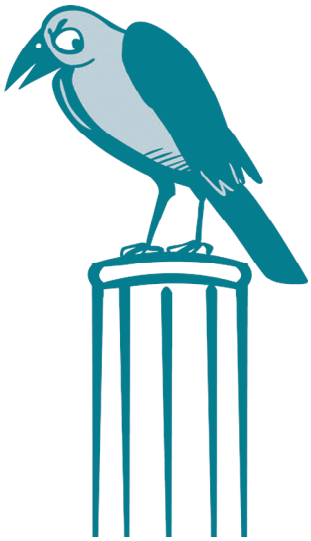

‘আর দেরি নয় ধর গো তোরা হাতে হাতে ধরগো’

কবি লিখেছিলেন, ‘দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী, আসিল যত বীরবৃন্দ সেরি।’ খুবই আহ্লাদের কথা, দেশমাতৃকার সেবায় এখন সেই বীরবৃন্দ হবু প্রধানমন্ত্রীরূপে আবির্ভূত। দেশে এখন যে কোনও পদার্থেরই অভাব হোক না কেন, প্রধানমন্ত্রীরূপে দেশ সেবার অধিকার পাওয়ার জন্য নিবেদিত প্রাণের কোনও অভাব নেই। তার মধ্যে একজন গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল তো প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত।

সেই কোন কালে এই গান্ধীপুঙ্গব তাঁর অর্বাচীন আবির্ভাবের সময়ই ঘোষণা করেছিলেন, আমি ইচ্ছে করলেই যে কোনওদিন প্রধানমন্ত্রী হতে পারি। কিন্তু হায় এতদিনেও তাঁর সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল। সুতরাং ‘আর দেরি নয়, ধরগো তোরা হাতে হাতে ধরগো, সামনে মিলন স্বর্গ।’

সেই মিলন স্বর্গ রচনার একটি গ্র্যান্ড মহড়া হয়ে গেল সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে কুমারস্বামীর কুর্সিলাভের অভিষেক অনুষ্ঠানে। সেখানে সারা দেশ থেকে সব মহা মহা নেতা-নেত্রীর সমাবেশে কর্ণাটক রাজধানী সরগরম। একটিই প্রতিজ্ঞা যুক্তফ্রন্টের ধাঁচে লড়তে হবে একসঙ্গে, মোদী হটাও, দেশ বাঁচাও। সত্যিই তো মোদীর চার বছরের উচ্চকিত ‘জুমলা’ শুনতে শুনতে আসমুদ্র হিমাচলের কান ঝালাপালা। এবার ফিরাও মোরে। স্বাধীন ভারতে বিগত সত্তর বছরের মধ্যে যে পঞ্চাশ বছরে সুখস্বর্গ রচিত হয়েছিল সেই ফিউডাল সোশ্যালিস্ট, ইসলামিস্ট সেকুলার ও ডাইন্যাস্টিক ডেমোক্র্যাসি ফিরিয়ে আনতে হবে। আর নেতৃত্ব দানের জন্যে তো ইতালিয়ান গান্ধীর নয়নের মণি অপোগণ্ড কুলতিলক এক পায়ে খাড়া। এখন তো সে বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে, কেমন সব জ্ঞানগর্ভ বাতচিত করছে। এবার আর কার সাধ্য রোধে তার গতি।

কিন্তু মুশকিল হলো, সেখানে আবার যেন একটু কিন্তু কিন্তু ভাব দেখা যাচ্ছে। গান্ধী কংগ্রেসের এমেরিটাস লিডার হাস্যমুখী ইতালিয়ান রাজমাতা ও যুবরাজ সবায়ের সঙ্গে ঐকতান গড়ে তোলার জন্যে সুর ভাঁজলেও, অন্যান্যদের মধ্যে যেন একটু অন্য সুরের পোঁ। কেননা অনেক রাজ্য সুবেদারই এখন মাওবাদীদের গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরোর মতো, রাজ্য দিয়ে কেন্দ্র ঘেরো নীতিতে বিশ্বাসী। এবং সে বিষয়ে এনাদের আদর্শ কর্ণাটকের নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামী। এই কুমারস্বামীর সেকুলার দলকে বিধানসভা নির্বাচনের সময় পোলপণ্ডিতরা কিং মেকাররূপে অভিহিত করলেও, সকলের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে এই কুমার গৌরব শেষ পর্যন্ত কিং হয়ে বসেছেন। এতদিন নিয়ম ছিল, কুকুরই লাঙ্গুলকে নাড়াবে, কিন্তু এই গৌড়াতনয় প্রমাণ করেছেন লাঙ্গুল তেমন জবরদস্ত হলে, সেটাই কুকুরকে চক্রাকারে ঘোরাতে সমর্থ।

সেটাই হয়েছে সকল প্রধানমন্ত্রিত্ব অভিলাষীর আশার বিষয়। নির্বাচনোত্তর ঘোলাজলে মাছ ধরতে পারদর্শী হলে কোনও কিছুই অনায়ত্ত থাকতে পারে না। এমনকী রাজ্যে হেলে ধরতে না পারলেও কেন্দ্রের কেউটে ধরতে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। সেটা শুধু লেজে খেলানোর কৌশলের মারপ্যাঁচ মাত্র। তাই বেঙ্গালুরুর সুবেদারদের অষ্টবজ্র সম্মেলনে সকলেই মিলনের কোরাস তুলতে ব্যস্ত। তার পরে সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে কৈরানাতে ও তার আগে আরও দুটি লোকসভা কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদের সম্মিলিত শক্তিতে বিজেপি প্রার্থীর পরাজয়ের পর নতুন করে আবার বিরোধী শক্তির স্তিমিত মনে আশার সঞ্চার করেছে।

তবে উত্তরপ্রদেশে না হয় ফুফি-ভাতিজার সমন্বয়ে আত্মমগ্ন বিজেপিকে একহাত নেওয়া গেছে, কিন্তু দেশজুড়ে দিকে দিকে ফুফি-ভাতিজার তো অভাব নেই। তার কী হবে গা। কুমারস্বামী কর্ণাটকে এবং তাঁর পিতাজী দেবেগৌড়াজী যেভাবে কেন্দ্রে নেপোয় মারে দই করে প্রধানমন্ত্রীরূপে অভিষিক্ত হয়েছিলেন, সেটিই এখন অনেকের আশার আলো। তাই মাতা-পুত্রের সুযোগ্য নেতৃত্বে যখন সর্বভারতীয় কংগ্রেস এখন জনপথ কংগ্রেসে পরিণত, সেখানে যে কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অবধারিতভাবে বিরোধী সমন্বয়ের চেয়ারম্যান হবেন সেটা গণ্য হতে পারে না। কেননা রাজনীতিতে জোর যার মুলুক তার। আর নির্বাচিত সভার আসল রহস্য হলো সংখ্যায়। এই সাংখ্যদর্শনে হাতি থেকে ইঁদুরে পরিণত গান্ধী কংগ্রেস যে একচ্ছত্র প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিদার হতে পারেন, এমন কথা হলফ করে বলা যায় না।

সেই জন্যেই ‘মোদী হটাও’ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে একটি ফ্রন্টাল ফাটল দেখা

দিয়েছে। প্রিন্স গান্ধীর কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে ফেডেরাল ফ্রন্ট নামে একটি তৃতীয় ফ্রন্টের সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে। মোদীর বিরুদ্ধে এককাট্টা সর্বদলের একটি বিরোধী ফ্রন্ট হবে, অথবা কংগ্রেসকে অচ্ছুতকন্যা করে অন্যান্য স্ব স্ব প্রধান রাজ্য দলকে নিয়ে একটি আলাদা ফ্রন্ট গড়া হবে সেটাই বিবেচনার বিষয়। বরের ঘরের পিসি ও কনের ঘরের মাসি বামপন্থীরা অনেকদিন ধরেই এই তৃতীয় ফ্রন্টের মহান সাফল্যের দিবাস্বপ্নে বিভোর ছিলেন। এখন তেনাদের হতমান দশা, কার সঙ্গে জুটে অস্তিত্ব বজায় রাখা যায় তাই নিয়েই তাদের পার্টি প্লেনামে তুমুল তর্ক হয়ে গেল। কিন্তু তাতে পর্বতের মুষিকপ্রসব ছাড়া কোনও স্থির সিদ্ধান্তের দেখা মিলল না।

বেঙ্গালুরুর আগে বিহারে বিজেপির পরাজয়ের পর, নীতীশ কুমারের অভিষেকের সময়, পাটনায় একটি বিরোধী ঐক্যের স্ট্রেঞ্জ বেড ফেলোদের মহা সম্মেলন হয়েছিল। পাটালিপুত্রের সেই গান্ধী ময়দান থেকেই একটি বিরোধী ঐক্যের মহাওঙ্কার ধ্বনি উঠেছিল। কিন্তু নীতীশ কুমারের দলভঙ্গের পর সেটি তেমন জমে উঠতে পারেনি। তার পরে বিজেপির বিজয় রথ গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলার ফলে এবং ত্রিপুরায় বিজেপির ক্ষমতা দখলের পর মিডিয়া পণ্ডিতরা বলতে শুরু করলেন বিজেপি নাকি অপ্রতিরোধ্য। এখন আবার তেনারা শৃগালী ঐক্যতান জুড়েছেন, একতাই শক্তি, একতাই বল। বিরোধী ঐক্য হলেই নাকি বিজেপি কুপোকাত।

একথা তো অবধারিত সত্য যে, একের সঙ্গে একের লড়াই হলে শাসকদলের কাজের ক্রটি ধরে জনসমর্থন আদায় করা সহজ। কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সর্বদলের সমন্বয় ঘটেছিল বলেই ইন্দিরা সরকারের পতন ঘটে। আবার পশ্চিমবঙ্গে, বামফ্রন্টের শয্যাসঙ্গী কোলাবোরেটর কংগ্রেস রাজ্য বিরোধীহীন করার ফলে ফ্রন্টের তিন দশকের রাজত্ব অব্যাহত থাকে। অতি দর্পে হত লঙ্কা, স্ট্যালিনিস্ট বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শিল্প স্থাপনের মূর্খ নীতিতে গোলাগুলি চালনার ফলে বিরোধীরা এককাট্টা হয় বলেই, এখানে উন্নততর বামফ্রন্টের সাজানো বাগান শুকিয়ে যায়। কেন্দ্রে ইন্দিরার পতনের সময় এবং রাজ্যে বামফ্রন্টের পতনের সময়, সব দল এক হয়েছিল বলেই সরকারের পতন ঘটে। কিন্তু জোড়াতালি দেওয়া এই ফ্রন্টে সমন্বয়ের অভাবেই যেমন জনতা পার্টির সরকার ভেঙে পড়ে, তেমনি রাজীব পরবর্তী ভিপি সিংহ সরকার, এইচ ডি দেবেগৌড়া সরকার, গুজরাল সরকার স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। সেই অস্থিতিশীলতা দূর হয় নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার ও তার পরে অটলবিহারী নেতৃত্বে এনডিএ সরকার গঠনে। কিন্তু অটলবিহারীর সুদক্ষ প্রধানমন্ত্রিত্বে যখন বিজেপি পরবর্তী সরকার গঠনের দ্বারপ্রান্তে তখন বিজেপির কিছু অতি বুদ্ধিমানের অতি তৎপরতায় 'ইন্ডিয়া সাইনিং' স্লোগান তোলার ফলে শেষে বিজেপি ডাউনিং-এর ভরাডুবি ডেকে আনে।

তার পরে আদবানিজীর পার্লামেন্ট অচলের ব্যর্থ নেতৃত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, স্থিতিশীলতার জন্যেই মনমোহন সিংহের ইউপিএ-১ ও ইউপিএ-২ সরকার রাজত্ব করে। কিন্তু সর্বসমক্ষে পুকুরচুরি রোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় সর্বনিন্দিত মোদীর বলিষ্ঠ উচ্চারণের 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে বিজেপিকে একক গরিষ্ঠতা দেয়। ■

চিঠিপত্র

পঞ্চায়েত নির্বাচন ও তৃণমূলি সন্ত্রাস

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে যে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও অরাজকতা চলেছে তা শুধু এদেশে নয়, বিশ্বেও বিরল। শুধু বিশ্বেই নয়, এদেশেরও কোনও রাজ্যে এ রাজ্যের মতো নির্বাচন নিয়ে শাসকদলের সমর্থক ও আশ্রিত গুণ্ডা-সমাজবিরোধীদের সহিংসতার নজির নেই। পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই শাসকদলের মদতপুষ্ট নরপিশাচরা বিরোধী দলগুলির সম্ভাব্য প্রার্থীদের বাড়ি গিয়ে ভীতিপ্রদর্শন, এমনকী ধর্ষণ, খুন, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, ব্যবসা বন্ধ করা, মাঠের ফসল নষ্ট করা, মেয়ে-বউ-বোনকে তুলে নেওয়া, মিথ্যে কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি-শাসানি দেওয়া শুরু হয়। এসব সত্ত্বেও যাঁরা সাহস করে বিডিও অফিসে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে যান তাঁদের রাস্তায় ফেলে করা হয় মারধর ও রক্তাক্ত। তৃণমূল জল্লাদদের মারের হাত থেকে রেহাই পাননি বিরোধীদলের প্রাক্তন সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী এবং নেতারাও। অনেককেই ভর্তি হতে হয়েছে হাসপাতালে। কয়েকজনের মৃত্যুও ঘটেছে। ওই সময় শাসকদল আশ্রিত ও মদতপুষ্ট খুনি-মস্তান-সমাজবিরোধীদের হাতে দেখা গেছে আগ্নেয়াস্ত্র, তরবারি ও লাঠিসোটা। পুলিশ ছিল নির্বাক, নিশ্চল ও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। প্রশাসনও পরিণত হয়েছে দলদাসে। শাসকদল সন্ত্রাস চালিয়ে ইতিমধ্যেই দখল নিয়েছে হাজার হাজার বিরোধীশূন্য গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ। ৩৪ শতাংশ প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে যা গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে। অতঃপর নির্বাচনের দিন চলেছে শাসকদল আশ্রিত জল্লাদ বাহিনীর বুথে বুথে বল্গাহীন ছাপ্পা, রিগিং, বুথ দখল ও সশস্ত্র আস্ফালন। পরিণামে রাজ্যের ৫৬০টি বুথে পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা— 'বদলা নয়, বদল চাই'। কিন্তু আজ আমরা কী দেখছি? দেখছি, বদল নয়, বদলা চাই নীতি। এমতাবস্থায় স্বৈরাচারী তৃণমূল সরকারের পতন আর বেশি দূর নয়। তবে এই সরকারের পতন ঘটলে তৃণমূল দলটাই হয়ে যাবে ছিন্নমূল— যেমন আজ সাইনবোর্ড দলে পরিণত হয়েছে কংগ্রেস ও বামদলগুলি। এদের সবারই 'পাপের ঘড়া পূর্ণ'। তাই তৃণমূলেরও বিদায় আসন্ন।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

জাতীয়তাবোধ ও কংগ্রেস

ইদানীং পশ্চিমবঙ্গের একটা প্রথম শ্রেণীর পাক্ষিক পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে পাঠকের মতামতে ফুটে উঠেছে--- 'স্বাধীনত্তোর ভারতে নির্মাণ আশে যতটুকু হোক না কেন কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক দর্শন তার ভিত তৈরি করে রেখেছে, এমনকী জাতীয়তাবোধ থেকে কংগ্রেস কখনও বিচ্যুত হয়নি কোনও পরিস্থিতিতেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতভাগের আগে কংগ্রেস ও কংগ্রেসিদের জাতীয়তাবোধ কি কম ছিল? তাহলে দেশভাগ রোধ করতে পারলো না কেন? দেশভাগের পর অধিকসংখক মুসলমান এপারে থেকে গেছে, তারা সভাসমিতিতে বন্দে মাতরম গাওয়া হলে প্রতিবাদ করে কোন যুক্তিতে? বন্দে মাতরম্ শব্দটি জাতীয়তাবোধের মধ্যে পড়ে না? কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলোপে কাশ্মীরের মুসলমানদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানরা সহমত পোষণ করে? এসব উত্তর খোঁজা কি অন্যায়?

এই প্রসঙ্গে ১৯০৯ সালে ফিরে তাকালে কংগ্রেসের চরমপন্থীদের প্রতিনিধিস্বরূপ শ্রী অরবিন্দ ঘোষ বলেছিলেন— 'পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী বা পৃথক প্রতিনিধিত্ব এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের গ্রহণ করা উচিত নয়। তার কারণ এই নয় জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে আসা বিধানসভাগুলি বিশাল মুসলমান প্রভাবের বিরোধী, তার কারণ এই যে আমরা এমন কোনও পার্থক্যবোধে অংশগ্রহণ করবো না যা হিন্দু ও মুসলমানকে চিরস্থায়ীরূপে পৃথক পৃথক রাজনৈতিক এককরূপে বিচার করে এবং তদ্বারা এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য রাষ্ট্রের অভিবৃদ্ধিকে ব্যাহত করে।' তৎকালীন উত্তাল রাজনৈতিক পটভূমিকায় শ্রীঅরবিন্দের সুচিন্তিত দার্শনিক মতামত ছিল— 'মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ, নিজেদের প্রথমে ভারতীয় ও পরে মুসলমান মনে করায় তাদের অস্বীকৃতি বৃহৎ মুসলমান রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের জন্মগত ও রক্তগত একত্ব সত্ত্বেও আমাদের চেয়ে তাদের সঙ্গেই তারা বেশি একাত্মতা অনুভব করেন। হিন্দুদের তেমন কোনও অবলম্বন নেই, ভালো হোক বা মন্দ হোক তাঁরা এই মাটির সঙ্গে, শুধু এই মাটির সঙ্গে বাঁধা। নিজের মাকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না বা তাঁকে খণ্ডিত করতে পারেন না। আমাদের আদর্শ সেজন্য এক ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যা তার মর্মে ও পরম্পরায় বিশেষভাবে হিন্দু, এই হিন্দুরা প্রস্তুত করেছেন এই দেশকে ও জনগণকে এবং তাঁর অতীতের মহত্ত্বের সাহায্যে আজও তাঁর সভ্যতা, তাঁর সংস্কৃতি এবং অজেয় পৌরুষকে বজায় রেখেছেন ও ধারণ করে আছেন, এত বিরাট যে মুসলমানকে এবং তাঁর সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে গ্রহণ করে নিজের অঙ্গীভূত করতে সমর্থ।' তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব শ্রীঅরবিন্দের এই সতর্কবার্তার কোনও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি। পরবর্তীকালে পণ্ডিত নেহরু তাঁর 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে মাত্র দু' লাইনে শ্রীঅরবিন্দের উপর বক্তব্য সেরেছেন আর পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রবক্তা মহম্মদ ইকবালের গালভরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। এতদিন বুদ্ধিজীবীদের কলমে জাতীয়তাবোধের কথাই বেশি করে উচ্চারিত হতো। এখন কংগ্রেস ও

কংগ্রেসীদের জাতীয়তাবোধের বোধগম্য করতে কোন দর্শনের পাতা উলটাবো ভেবে পাচ্ছি না। পরিশেষে বলি, কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রবাদ স্বাধীনতার পর তাদের শাসনাধীনকালে কতটুকু শর্ত পালন করা হয়েছে? সমাজবাদের প্রাথমিক শর্ত ছিল সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে শ্রেণীহীন সমাজ গঠন। এই শর্তপালনে কংগ্রেস পুরোপুরি ব্যর্থ। ভারতবর্ষের ইতিহাস তাই বলছে।

—বিরূপেশ দাস,
বর্ধমান।

৪৬-এর দাঙ্গা ও গান্ধীজী

১৯৪৬-এর 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস' নিয়ে প্রণব দত্ত মজুমদারের প্রবন্ধ 'সারারাত আল্লাহ হো আকবর সকালে শকুনের ভোজ' (স্বস্তিকা ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫) তথ্যবহুল, উপযোগী। বর্তমান প্রজন্মের কাছে সেই সময়ের বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য কিছু সংযোজন মানসে এই চিঠি।

বাংলার মুসলিম লিগ কিন্তু বাংলা ভাগের বিরোধিতা করেছিল, তারা চেয়েছিল অখণ্ড বঙ্গ। লিগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বাংলার নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ছিল এই নিয়ে। ১৯৪৭-এর ১০ জুন সারা ভারত মুসলিম লিগ বঙ্গ বিভাগ মেনে নেবার পর বাংলার লিগ নেতারা হতাশ হয়ে বলেছিলেন, আমরা চেয়েছিলাম মাংস, দেওয়া হলো পাথর। হতাশার কারণ, কলকাতাকে পাকিস্তানে রাখা গেল না! সাধারণ মানুষ ভেবেছিল, দাঙ্গা-খুনোখুনি বন্ধ হবে এরপর। কিন্তু কোথায় কী!

গান্ধীজীকে 'মহান' প্রতিপন্ন করার জন্যে যত গল্প প্রচারিত হয়, তার একটি হলো দেশ স্বাধীন হবার রাতে তিনি ছিলেন মুসলমান বস্তিতে। আদৌ তা নয়। ১৫০ বেলেঘাটা মেন রোডে হায়দারি ম্যানসন ছিল নবাব আবদুল গনির পরিত্যক্ত বাগানবাড়ি, 'বাঈ আম্মা' বলে ডাকা হতো যে ভদ্রমহিলা থাকতেন ওখানে। ১১ আগস্ট গান্ধীজী সোদপুর থেকে কলকাতা পৌঁছলে জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া যেমন জাগল, তেমনই কালো পতাকা হাতে বিক্ষোভও দেখাল অনেকে, কলকাতা ছেড়ে যাও— এ গর্জন উঠল। বলা হলো, তিনি বরং কাঁকুড়গাছি-উল্টোডাঙ্গা অঞ্চলে গিয়ে বাস করুন, কারণ ওই সব এলাকা থেকে প্রচুর হিন্দু পরিবার উৎখাত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, ১৯৪৬-এ কলকাতা যখন জ্বলছে, হিন্দুরা মার খাচ্ছে, তখন কোন গর্তে লুকিয়ে ছিলেন গান্ধী, কোথায় ছিল তাঁর দায়িত্ববোধ?

বস্তুত, জাতির বাবা বলে চিহ্নিত ব্যক্তিটির দ্বিচারিতা আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে অনেকবারই। মৌখিকভাবে তিনি বারংবার দেশভাগের বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু কাজের সময়ে থেকেছেন নীরব। স্বীকার করেছেন, দেশভাগ কংগ্রেসের 'নৈতিক ব্যর্থতা'। পাশাপাশি এও জানিয়েছেন যে, কংগ্রেসের পথে তিনি বাধা হবেন না।

১৯৪৭-এর ৩১ আগস্ট গ্র্যান্ড হোটেলে এক সমাবেশে মুসলমান ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে গান্ধীজীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মুসলমান- অধ্যুষিত এলাকায় তিনি ঘাঁটি গেড়েছেন, তাদের থেকে সংবর্ধনা পাচ্ছেন— এই বাস্তবতার পাশাপাশি অভিযোগ ওঠে মুসলমান গুণ্ডাদের তিনি প্রশ্রয় দিচ্ছেন। গান্ধীবাবার আশ্বাসে কিছু মুসলমান পরিবার মিঁয়াবাগান বস্তিতে ফিরে এসেছিল, কিন্তু নতুন করে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হতে তারা ভয় পেয়ে ট্রাকে চেপে রাজাবাজারের দিকে চলে যাচ্ছিল। সেই ট্রাকে গুণ্ডাদের ছোঁড়া বোমায় দু-জন তৎক্ষণাৎ নিহত— আর গান্ধীবাবা যথারীতি বলেন, এই আমি আবার অন্নজল ত্যাগ করলাম, যতক্ষণ না কলকাতা ঠাণ্ডা হয়।

ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, গান্ধীকে বেইজ্জত করার জন্যই ফের দাঙ্গা লাগানো হলো। প্রতিশোধ নেওয়া-নেওয়ির তো শেষ নেই কোনও! গান্ধীর অনশনের মধ্যেই ছুরিকাহত হলেন গান্ধীবাদী সংগঠক 'কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ'র প্রধান উদ্যোক্তা শচীন্দ্র মিত্র। 'সংগঠন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ৩ সেপ্টেম্বর মেডিক্যাল কলেজে তাঁর মৃত্যু হলো। তাঁর শেষ কথা ছিল, 'আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।' শচীন্দ্র স্মরণে গান লিখেছিলেন সজনীকান্ত দাশ।

পরদিন শহিদ হন গান্ধীবাদী কর্মী স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুশীল দাশগুপ্ত। বীরেশ্বর ঘোষেরও নাম শোনা যায়। শান্তি অভিযানে বেরিয়ে প্রাণ গেল গুণ্ডাদের হাতে। হ্যাঁ, লোক-দেখানো আবেগে কিছু অস্ত্রশস্ত্র গান্ধীবাবার পায়ে জমা পড়েছিল বটে, শোনা যায় সোহরাবর্দি সাহেবও নাকি প্রকাশ্য জনসভায় ক্ষমা চেয়েছিলেন। কিন্তু ওসব ন্যাকা-ন্যাকা রিচুয়ালে কি ইতিহাস পথ পাল্টায়? সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার স্বার্থে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে, যথাযথ স্বচ্ছ আলোয় সেই সময়টিকে দেখা দরকার আরও বেশি করে।

—নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়,
৬, মধ্যপাড়া, রহড়া, কলকাতা-১৮।

নীলে নীল

নীল বাড়িতে নীল নকশায় রক্ত ঝরছে পথে।
নীল চটিতে মাড়িয়ে দেব বিরোধীদের মাঠে।
নীল আকাশে উড়ছে শকুন, পথ হয়েছে ভাগাড়,
গণতন্ত্র, সে আবার কী! সব করেছি সাবাড়।
নীলচে আলোয়, লালচে চোখে মদিরাপানে সেনা,
করলে হুকুম, ফেলে দেবে লাশ,
পুলিশের কাজ তো শুধু শোনা।
নীলাদিদির নীল ভীতিতে, সবই নীলে-নীল,
দেশদ্রোহীতে, দুষ্কৃতীতে রাজ্যময় কিলবিল।
শুনেছি মোরা সবার নাকি সহ্য হয় না নীলা—
বিদায় নিয়ে রাজ্যটাকে শান্তিতে বাঁচতে দে-মা।

—বিবেক আচার্য,
কলকাতা-১৯।

মায়েরা কঠোর না হলে সুসন্তান জন্মাবে না

অঙ্গনা

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

ইদানীং বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের নানা অত্যাচারের কাহিনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছে। কখনও অসহায় বৃদ্ধা মাকে স্টেশনে ফেলে সন্তান পালাচ্ছে। কখনও সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে করতে না পেরে সন্তান প্রহার করছে। কখনও বা অশীতিপর বৃদ্ধাকে ঘরে বন্ধ রেখে মেয়ে সপ্তাহাধিক কালের জন্য বাইরে ভ্রমণে যাচ্ছে। সন্তানের ইচ্ছেয়, নিজের চূড়ান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পরিবার থেকে দূরে, সংসারের বাইরে বৃদ্ধাবাসে জীবনের অবশিষ্ট দিন-রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।

বাবা-মায়ের জন্য আদালতের দরজা উন্মুক্ত, কিন্তু নিজের সন্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে অধিকাংশ বাবা-মা রাজি হন না। মাসাধিককাল আগে এমনই একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল। একমাত্র কন্যা বৃদ্ধা মাকে ঘরে বন্ধ রেখে ভ্রমণে যায়। ন'- দশদিন পর বৃদ্ধার আর্তনাদ শুনে প্রতিবেশীরা যখন তাকে উদ্ধার করেন তখন তিনি অসুস্থ। হাসপাতালে যাওয়ার প্রাক্কালে বৃদ্ধা মা প্রতিবেশীদের বারবার অনুরোধ করেছিলেন তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের যেন কোনও শাস্তি না হয়, তারা নির্দোষ।

সমস্যা আজকের নয়। ব্যাসদেব বলেছিলেন, ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার পরও যে-সব বাবা-মা সংসারে থাকেন তাঁরা নিজেদের দুঃখ ডেকে আনেন। ব্যাসদেব সত্যবতীকে বলেছিলেন, ''তোমার পৃথিবী যৌবন হারিয়েছে মা, এখন সংসারে থাকলে সংসারের কুৎসিত দিকগুলোই নিছক তোমার চোখে পড়বে। বানপ্রস্থে চল।'' সত্যবতী যাননি। কিছুদিন পর সত্যবতী স্বয়ং ব্যাসদেবকে ডেকে বলেন, ''তোমার কথাই সত্য, এবার বানপ্রস্থে যাব।''

লক্ষণীয়, সেকালের বাবা-মা স্বেচ্ছায় বানপ্রস্থে যেতেন। সন্তানের ইচ্ছেয় নয়, এ যুগে সন্তান বাবা-মাকে বাধ্য করে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে। নয়তো তাঁদের জীবনে অবর্ণনীয় দুঃখ নেমে আসে।

পিতা-মাতা স্বয়ং কি এই পরিণতির জন্য দায়ী? তাঁরাও কি যৌবনে তাঁদের পিতা-মাতার সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করেছেন, যা দেখে সন্তান শিখেছে? পুরাণে আছে, দ্বাপরের অবসানে ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হতে অধর্মের সৃষ্টি হয়। অধর্মের স্ত্রীর নাম মিথ্যা। মিথ্যার গর্ভে ও অধর্মের ঔরসে দম্ভ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দম্ভের নিজ ভগিনী মায়ার সঙ্গে পরিণয় ঘটে এবং তাদের লোভ নামে এক পুত্রসন্তান জন্মায়। লোভ তার ভগিনী হিংসাকে বিবাহ করেন। তাদের কলি নামক পুত্র হয়। নামগুলো অবশ্যই প্রতীকী। এর অর্থ মিথ্যা ও অধর্ম থেকে দম্ভ জন্মায়। দম্ভ থেকে লোভ জন্মায়, লোভ থেকে ক্রোধ ও হিংসার উৎপত্তি। কিন্তু এমন বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছেন যাঁরা পিতা-মাতার উপর অত্যাচার করার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না, অথচ নিজের সন্তানের হাতে তাঁদের অত্যাচারিত হতে হয়। তবে কি অত্যধিক স্নেহে সন্তানকে লালনপালন করাই এর কারণ? সম্ভবত তাই। কিছু বাবা-মা, বিশেষ করে মা নিছক লিখিত পরীক্ষায় সাফল্য ব্যতীত সন্তানের কাছে আর কিছু কামনা করেন না। তাকে বোঝানো হয়, 'তোমাকে বাবা-মা, ভাই-বোনের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে পাশে থাকতে হবে না।' আত্মীয়-স্বজন, সমাজ-সংসারের প্রতি তার কোনও কর্তব্য নেই। সে শুধু ভালো 'রেজাল্ট' উপহার দেবে। সেই সন্তান জীবনে সফল হতে পারে, কিন্তু মানুষ হবে কেন? মায়েদের একটু কঠোর হতে হবে, নইলে সন্তান সুসন্তান হবে না।

উত্তম পানীয় মধু

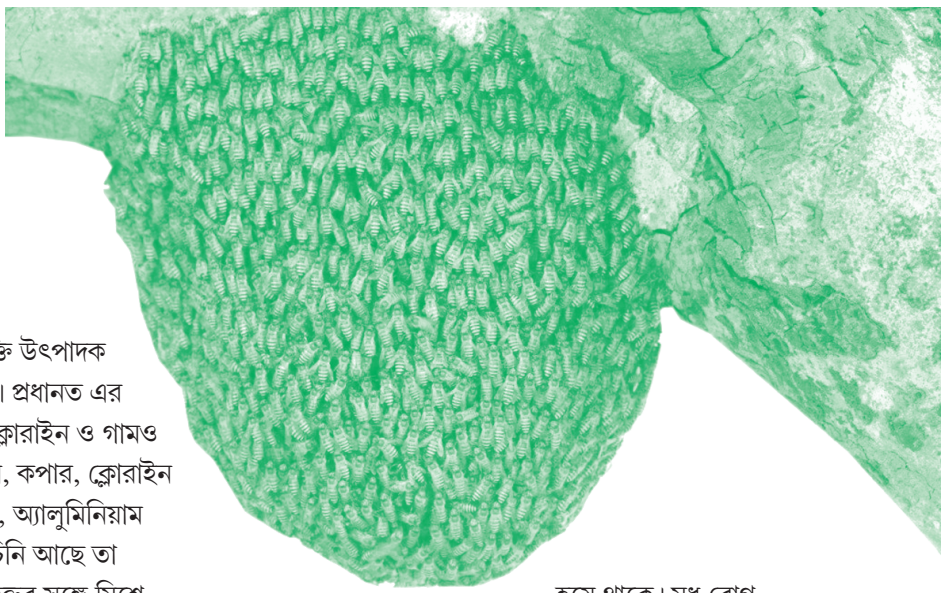

সত্যানন্দ গুহ

মধু সুমিষ্ট, উপাদেয় ও পুষ্টিকারক। শক্তি উৎপাদক যত রসায়ন আছে, তার মধ্যে মধু সর্বপ্রধান। প্রধানত এর উপাদান চিনি ও জলীয় পদার্থ। লাক্রোজ, ক্লোরাইন ও গামও কিছুটা আছে। মিশ্রণাকারে সিলিকা, আয়রন, কপার, ক্লোরাইন ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ফসফরাস,সালফার, অ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম আছে। মধুর মধ্যে যে চিনি আছে তা পরিপাক কার্যে সহায়ক হয়। তা সরাসরি রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।

গরমের দিনে এক গেলাস ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে কিছুটা মধু ও লেবুর রস মিশেয়ে তৈরি সরবত বেশ আরামপ্রদ। কনকনে শীতের সময় এক গেলাস গরম জলের সঙ্গে কিছুটা মধু মিশিয়ে খেলে শীত ভাব কেটে যায়। এক কাপ চায়ের সঙ্গে দুই চামচ মধু ও একটু লেবুর রস মিশিয়েও খাওয়া যায়। রাত্রে শোয়ার সময় এক গেলাস ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে কিছুটা মধু মিশিয়ে খেলে ভালো ঘুম হয়।

মৌমাছি মধু তৈরি করে। এছাড়াও অন্যান্য দিক থেকে এরা আমাদের অনেক উপকার করে থাকে। নানাভাবে এরা আমাদের পুষ্টির সহায়তা করে। মৌমাছিরা সাধারণত আমাদের যে উপকার বা সেবা দিয়ে থাকে তা হলো ফুলে ফুলে পুষ্পরেণু বহন করে পরাগমিলনে সাহায্য করা। মধুর চাইতেও এর মূল্যায়ন বেশি। পরাগ মিলনের জন্য মৌমাছিরা সবচেয়ে উত্তম।

ওষুধ হিসেবে মধুর ব্যবহার বহু এবং বিবিধ। সাধারণত ঠাণ্ডা এবং কাশি ও কফের প্রতিষেধক হিসেবে শীতের সময় এক চামচ মধু গৃহস্থ মাত্রেই ব্যবহার করে থাকে। জিহ্বার ক্ষতে, অন্ত্রের ক্ষতে এবং বহুমুত্র রোগে শরীরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার (অ্যালার্জি) নিরাময়ক হিসেবে মধুর ব্যবহার খুবই হয়ে থাকে। মধু রোগ জীবাণু নাশক এবং টাইফয়েড ডিসেন্ট্রিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শিশুদের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। কারণ মধু অম্ল সৃষ্টি করে না ও উত্তেজনাকারকও নয়। ম্যারজমাস, ম্যালনিউট্রিশনের চিকিৎসায় এবং তজ্জাতীয় অবস্থায়ও মধু ব্যবহার করা হয়।

কেউ যদি মধুর জন্য মৌমাছি পালন করে, তবে তা থেকে উপজাত যা পাওয়া যাবে তাও লাভজনক। তার মধ্যে মোম খুবই মূল্যবান। নানা শিল্পে মোম বহুভাবে ব্যবহার করা হয়। ফর্মাসিউটিক্যাল, কসমেটিক এবং রং শিল্পে মোম বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। মৌমাছির আর একটি উপজাত হলো এর বিষ (বি ভেনম)। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় এর গুরুত্ব খুবই। বাত, সংক্রামক ব্যাধি ও উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় খুবই উপকারী। অ্যান্টিবায়টিক গুণসম্পন্ন বলে ব্রঙ্কিয়েল অ্যাজমা ও একজিমার চিকিৎসায় বিশেষ উপকারী।

মধু নানা প্রকারের হয়। তার ব্যবহারও হয় বিভিন্ন ভাবে। প্রতিটি প্রকারের মধ্যে মিষ্টত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে তফাত আছে। এই সম্পর্কে সুশ্রুত সংহিতায় বিশদ ভাবে উল্লেখ আছে। প্রাচীন আয়ুর্বেদে শল্য চিকিৎসায় এর বহুল ব্যবহারের উল্লেখ আছে। আলসার ও চোখের রোগেও মধুর ব্যবহার আছে। মধু ক্ষুধাবর্ধক।

(লেখক প্রাকৃতিক চিকিৎসক)

নীতীন গড়করি : এক দায়িত্ব সচেতন উদ্যোগী পুরুষ

চন্দ্রভানু ঘোষাল।। নরেন্দ্র মোদীর ক্যাবিনেটে যোগ্য লোক কিছু কম নেই। কিন্তু তাঁদের সকলের মধ্যে উজ্জ্বল নীতীন গড়করি। এমন চোখধাঁধানো সাফল্য খুব কম মানুষের কপালেই জোটে। রাজনৈতিক জীবনে শুরু থেকে তিনি বিশ্বাস করেন রাজনীতি হলো আর্থসামাজিক পটপরিবর্তনের শক্তিশালী হাতিয়ার। সেই লক্ষ্যেই তিনি বরাবর রাজনীতি করেছেন। জন্ম নাগপুরের মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে। মা-ই ছেলেবেলায় সমাজসেবার সুপ্ত ইচ্ছে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এম.কম, এল এল বি পাশ করে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্সে ডিপ্লোমা করার পর যখন রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তখন ওই সমাজসেবার ইচ্ছেই তাঁকে আরও দূরে যাবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। ১৯৮৯ সাল থেকে তিনি মহারাষ্ট্র লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য। ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত তিনি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের বিরোধী নেতা ছিলেন। ২০০৯ সালে তিনি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। এর মধ্যে ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত তিনি মহারাষ্ট্রের পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। আজ তিনি যা তার সূত্রপাত সেই সময়ে। বলা যেতে পারে মন্ত্রী হয়ে তিনি মহারাষ্ট্রের গ্রামের ভোল পালটে দেন। তাঁর পরিকল্পনায় সায় দিয়ে মহারাষ্ট্র সরকার গ্রামে রাস্তাঘাট তৈরির জন্য ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। সে সময়ে টাকার অঙ্কটা ছিল বিশাল। গ্রামের রাস্তা তৈরি করতে এত টাকা দেওয়া হতো না। হাইওয়ে বানিয়ে মহারাষ্ট্রের ১৩,৭৩৬টি গ্রামকে তিনি জুড়ে দেন। স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর কেটে গেছে কিন্তু এইসব গ্রামে কোনও রাস্তাই তৈরি হয়নি। পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে তিনি মুম্বই-পুনে এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করেন। এই সময় নীতীন গড়করির জীবনে এল নতুন বাঁক। রাস্তা তৈরিতে তাঁর সাফল্য লক্ষ্য করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তাঁকে ডেকে পাঠালেন। মূলত তাঁর অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে তৈরি হলো ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি নামের সংস্থাটি। নীতীন গড়করিকে ন্যাশনাল রুরাল রোড

ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করা হলো। নানা সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি রিপোর্ট পেশ করলেন। কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করল সেই রিপোর্ট এবং গ্রামে-গ্রামে নতুন রাস্তা তৈরি ও পুরনো রাস্তাগুলির রক্ষণা-বেক্ষণের কথা মাথায় রেখে তৈরি হলো ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা। যার নাম প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা। প্রকল্পের আনুমানিক খরচ ৬০,০০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পটি ছিল বাজপেয়ী সরকারের অন্যতম সফল স্বর্ণ চতুর্ভুজ প্রকল্পের অন্তর্গত। এক কথায় বলতে গেলে এই প্রকল্প ভারতের গ্রামগুলিকে এক লহমায় ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্ধকার থেকে একবিংশ শতকের উজ্জ্বল আলোয় নিয়ে এসেছিল। সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি নীতীন গড়করির আগ্রহের জায়গাটি বহুধা বিস্তৃত। তিনি জল সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করেছেন। সৌরশক্তির প্রতি মানুষের সচেতনতা বাড়াতে নানারকম প্রকল্প রূপায়ণ করেছেন। সর্বোপরি তিনি কৃষক পরিবারের সন্তান। কৃষিক্ষেত্রের প্রতি তাঁর আকর্ষণ স্বাভাবিক। জৈব-জ্বালানি এবং অপ্রচলিত শক্তিনির্ভর প্রযুক্তিকে ভারতীয় কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে তিনি নিরলস চেষ্টা করে চলেছেন। এরকম একজন মানুষকে নরেন্দ্র মোদী যে ক্যাবিনেটের বাইরে রাখবেন না, সেটা স্বাভাবিক। ২০১৪ সালে দায়িত্ব পাবার পর নীতীন গড়করি যা করেছেন তাকে ইতিহাস বললে অতিশয়োক্তি করা হয় না। মাত্র চার বছরে এত বড়ো সাফল্য সত্যিই বিস্ময় জাগায়। ■

জোজিলা টানেল

এখন জোজিলা পাস দিয়ে শ্রীনগর থেকে কার্গিল হয়ে লেহ্‌তে পৌঁছতে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। পাঁচ বছর পর সময়টা কমে হবে পনেরো মিনিট। অর্থাৎ হাওড়া থেকে ধর্মতলা যেতে যে সময় লাগে, ঠিক সেই সময় শ্রীনগর থেকে লেহ্‌ পৌঁছনো যাবে। সম্প্রতি সড়ক ও পরিবহণ দপ্তরের এই প্রকল্পটির উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রকল্পের নাম জোজিলা টানেল। দৈর্ঘ্য ১৪.২ কিলোমিটার। এটাই দেশের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথ এবং এশিয়ার দীর্ঘতম দ্বিমুখী সুড়ঙ্গপথ।

তৈরি করতে খরচ হবে ৬,৮০৯ কোটি টাকা। সময় লাগবে পাঁচ বছর। প্রকল্পের রূপায়ণের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা ইতিমধ্যেই একে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভারতীয়দের দক্ষতার এক বিশেষ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার অন্যতম কারণ সুড়ঙ্গটি তৈরি হবে ১১,৫৭৮ ফুট উচ্চতায়। হিমালয়কে ভেদ করে এগিয়ে যাবে সুড়ঙ্গ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার, এখন শ্রীনগর আর লেহ্‌র মধ্যে যে জাতীয় সড়ক রয়েছে সেটি শীতকালে বরফে ঢাকা পড়ে যায়। এই কারণে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে লেহ্‌ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জোজিলা টানেল চালু হয়ে গেলে এই সমস্যা আর থাকবে না।

ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ে

ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ে তৈরিতে ৯,৩৭৫ জন মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। সমগ্র প্রকল্পটি রূপায়ণে খরচ হয়েছে ১১,০০০ কোটি টাকা। ১৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই এক্সপ্রেসওয়ে সাজানো হয়েছে সৌরবিদ্যুৎ চালিত আলোয়। ৫০০ মিটার অন্তর রয়েছে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা। সাজসজ্জায় ব্যবহার করা হয়েছে দেশের বিশেষ কিছু স্মারক। রয়েছে ৪০টি ঝরনাও। সড়ক ও পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী নীতীন গড়করি জানিয়েছেন, মাত্র ৫০০ দিনের মধ্যে শেষ হয়েছে এই প্রকল্প। দিল্লি থেকে জম্মু-কাশ্মীর, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থান যাওয়া এখন আরও সুবিধাজনক হয়ে উঠল। যেহেতু এই এক্সপ্রেসওয়ে মূল শহরের উপকণ্ঠে তাই পরিবেশ দূষণের মাত্রাও কমবে। নীতীন গড়করি জানিয়েছেন, ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়েতেও অত্যাধুনিক হাইওয়ে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ভিডিও ইনসিডেন্ট ডিটেকশন সিস্টেমও। এর ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। ৬ লেনের এক্সপ্রেসওয়েতে রয়েছে ৪টি বড়ো ও ৪৬টি ছোট ব্রিজ, ৩টি ফ্লাইওভার, ২২১টি আন্ডারপাস এবং ৮টি রোড ওভারব্রিজ।

দিল্লি-মিরাট এক্সপ্রেসওয়ে

আমাদের দেশে রাস্তার ধারে ঝুলন্ত বাগান দেখতে পাওয়া বেশ অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। সড়ক ও পরিবহণ দপ্তর দিল্লি-মিরাট এক্সপ্রেসওয়ের ধারে এমনই এক অত্যাশ্চর্য উপহার আমাদের দিয়েছে। সেই সঙ্গে যমুনা ব্রিজ সাজানো হয়েছে সৌরবিদ্যুৎ চালিত আলোকমালায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫-র ৩১ ডিসেম্বর এই এক্সপ্রেসওয়ের শিলান্যাস করেছিলেন। সম্প্রতি উদ্বোধন করলেন। মাত্র তিন বছরের মধ্যে এই অসাধ্যসাধন অতিমানবদের পক্ষেই সম্ভব। আগে দিল্লি থেকে মিরাট পৌঁছতে ৪-৫ ঘণ্টা সময় লাগত। এই এক্সপ্রেসওয়ের সৌজন্যে এখন লাগবে ৪৫ মিনিট। প্রকল্পের কাজ শেষ করার সময় ধরা হয়েছিল ৩০ মাস। কাজ শেষ হয়েছে ১৭ মাসে। সব থেকে বড়ো ব্যাপার সরকার শুধু গাড়িওয়ালাদের কথা ভাবেনি। এক্সপ্রেসওয়ের দুই ধারে রয়েছে ২.৫ মিটার চওড়া সাইকেল ট্র্যাক। পদাতিকদের জন্য ১.৫ মিটার চওড়া ফুটপাথ তার পাশে। এই প্রথম দেশের কোনও এক্সপ্রেসওয়েতে সাইকেল ট্র্যাক রাখা হলো। তাও আবার দিল্লি থেকে দাসনা পর্যন্ত। যার দূরত্ব ২৮ কিলোমিটার। দিল্লি থেকে নয়ডা যারা নিয়মিত যাতায়াত করেন, এক্সপ্রেসওয়ের ফলে তাদের খুবই সুবিধা হবে। দিল্লির নিজামুদ্দিন ব্রিজ থেকে শুরু হয়ে এক্সপ্রেসওয়ে চলে গেছে উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত পর্যন্ত। মোট দৈর্ঘ্য ৮২ কিলোমিটার। যার মধ্যে ২৭.৭৪ কিলোমিটার ১৪ লেনের। বাকি ৬ লেনের। প্রকল্প রূপায়ণে খরচ হয়েছে ৪,৯৭৫.১৭ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ১১টি ফ্লাইওভার, ৫টি বড়ো ও ২৪টি ছোট ব্রিজ, ৩টি রেলওভারব্রিজ, ৩৬টি আন্ডারপাস গাড়ির জন্য এবং ১৪টি সাধারণ মানুষের জন্য।

ধাপে ধাপে

ক্ষমতায় এসেই নরেন্দ্র মোদী সরকার সড়ক পরিবহণ এবং হাইওয়ে নির্মাণে বিশেষ দায়বদ্ধতার কথা ঘোষণা করেছিল। ২০১৪-১৫ ছিল রোগ এবং দাওয়াই বের করার বছর। তারপর শুরু হলো কর্মযজ্ঞ। ২০১৭ সালে মিলল স্বীকৃতি। ভারত উঠে এল বিএএ৩ পজিটিভ থেকে বিএএ২ স্টেবল রেটিংয়ে।

মাথার ওপর

নিঃসন্দেহে মন্ত্রী হিসেবে নীতীন গড়করি যথেষ্টই উদ্যোগী। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীকে মাথার ওপর পাওয়ায় তাঁর কাজ অনেকাংশে দ্রুততর ও সহজ হয়েছে। ২০১৭-১৮-র কেন্দ্রীয় বাজেট সড়ক পরিবহণ ও হাইওয়ে নির্মাণ মন্ত্রকের উদ্যোগকে আরও অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছে। ইনটিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড লজিস্টিক সামিট একে আরও মজবুত করেছে।

বছর	লক্ষ্যমাত্রা কিমি.	কাজ হয়েছে কিমি.
২০১৪-১৫	৭৯৭২	৪৪১০
২০১৫-১৬	১০,০৯৮	৬০৬১
২০১৬-১৭	১৫,৯৪৮	৮,২৩১

মেক ইন ইন্ডিয়া এবং স্কিল ইন্ডিয়া-কে সঠিকভাবে কাজে লাগালো কেন্দ্রীয় পরিবহন ও সড়ক যোগাযোগ মন্ত্রক

চেনানি-নাসরি টানেল

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কেন্দ্রীয় সরকারের মেক ইন ইন্ডিয়া এবং স্কিল ইন্ডিয়ার আদর্শ উদাহরণ এই টানেল। ৯ কিলোমিটার লম্বা। দুটি টিউব বিশিষ্ট এবং যে-কোনও ঋতুর উপযোগী। বিস্তার জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুর থেকে রমবান পর্যন্ত। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে ১২০০ মিটার উচ্চতায় টানেলের অবস্থান। জম্মু থেকে শ্রীনগর যেতে যে সময় লাগত এখন তার থেকে দু' ঘণ্টা কম লাগছে। ৪১ কিলোমিটার রাস্তা কমিয়ে দিয়েছে চেনানি-নাসরি টানেল। আগে জম্মু থেকে শ্রীনগর যাওয়ার পথে প্রায়শই ধস নামত। বরফ পড়ে বন্ধ হয়ে যেত রাস্তা। এছাড়া ছিল ট্রাফিক জ্যাম এবং গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়া। টানেলটি তৈরি করতে ৩৭২০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। চেনানি-নাসরি চার লেনের জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক প্রকল্পের একটি অঙ্গ।

ধোলা সাদিয়া ব্রিজ

২৬ মে, ২০১৭। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর ধোলাসাদিয়া ব্রিজের উদ্বোধন করেন। ব্রিজটির দৈর্ঘ্য ৯.৫ কিলোমিটার। এই ব্রিজ তৈরি হয়ে যাওয়ার ফলে পার্বত্য অসমের সঙ্গে অরুণাচলের পূর্বাংশের মধ্যে যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে। আগে ব্রহ্মপুত্র পারাপারের একমাত্র মাধ্যম ছিল ফেরিসার্ভিস। তাও সারাদিনে একটি মাত্র স্টিমার চলত। স্বাভাবিক ভাবেই দুই রাজ্যের মধ্যে যাতায়াতে পথের দূরত্ব এবং সময় অনেকখানি কমে গেছে। অসমের রুপাই (জাতীয় সড়ক ৩৭) থেকে অরুণাচলের মেকা/ রোয়িংয়ের (জাতীয় সড়ক ৫২) দূরত্ব ১৬৫ কিলোমিটার কমে গেছে। সময় আগে লাগত ৬ ঘণ্টা। এখন লাগছে ১ ঘণ্টা।

নর্মদা ব্রিজ, ভারুচ

নর্মদা ব্রিজ, ভারুচ

৯ মার্চ, ২০১৭। এদিন প্রধানমন্ত্রী ভারুচে নর্মদা নদীর ওপর একটি ব্রিজের উদ্বোধন করেন। ভদোদরা থেকে সুরাট যাওয়ার জন্য জাতীয় সড়ক ৮-ই ছিল ভরসা। নিত্যদিন ট্রাফিক জ্যাম এবং দুর্ঘটনা ছিল ভুক্তভোগী মানুষের সঙ্গী। নর্মদায় ব্রিজ হয়ে যাবার ফলে এই অঞ্চলের মানুষের দুর্ভোগ অনেকটা কমবে। ১.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ তারজালি দিয়ে বাঁধা এই ব্রিজ দেশের মধ্যে বৃহত্তম। এর আগে হুগলী নদীর ওপর নিবেদিতা সেতু এই প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছিল।

চম্বল ব্রিজ, কোটা

২৯ আগস্ট, ২০১৭। এদিন প্রধানমন্ত্রী কোটায় চম্বল নদীর ওপর একটি ব্রিজের উদ্বোধন করেন। ৬ লেনের এই ব্রিজটি তারজালি দিয়ে বাঁধা। তৈরি করতে খরচ হয়েছে ২৭৮ কোটি টাকা। এই ব্রিজ তৈরি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়েছে ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোর তৈরির কাজ।

আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় চারধাম মহামার্গ বিকাশ পরিযোজনা

এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে হিন্দু

তীর্থযাত্রীদের চারধাম যাত্রা আরও সহজ হবে। গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ হলো হিন্দুদের চারধাম। প্রত্যেকটিই উত্তরাখণ্ড রাজ্যে। প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ২ লেন বিশিষ্ট ৮৮৯ কিলোমিটার রাস্তা। খরচ ধরা হয়েছে ১২,০০০ কোটি টাকা। ৩৯৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের অনুমোদন পাওয়া গেছে কেন্দ্রের কাছ থেকে। এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়েছে ৩৪০ কিলোমিটার। প্রকল্পের কাজ শেষ হবে ২০২০-র মার্চে।

ভদোদরা মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ে

৪৭৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ভদোদরা মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ে, আমেদাবাদ-ভদোদরা এক্সপ্রেসওয়ে এবং মুম্বই-পুনা এক্সপ্রেসওয়ের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করবে। এর ফলে আমেদাবাদ যুক্ত হবে পুনার সঙ্গে। দুই শহরের মধ্যে দূরত্ব ৬৫০ কিলোমিটার। তিনটি পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। ফেজ ১ এবং ২-এর জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং পরিবেশ দপ্তর থেকে ছাড়পত্র আদায় করার কাজ শেষ হয়েছে।

বেঙ্গালুরু-চেন্নাই এক্সপ্রেসওয়ে (২৬২ কিলোমিটার)

বেঙ্গালুরু-চেন্নাই এক্সপ্রেসওয়ে একটি পরিবেশবান্ধব প্রকল্প। এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় ক্লোজড টোল সিস্টেমের কথা। বর্তমানে বেঙ্গালুরু থেকে চেন্নাই যাওয়ার জন্য দুটি রাস্তা আছে। একটি হোসটকে হয়ে এবং অন্যটি হোসুর হয়ে চেন্নাই যায়। প্রস্তাবিত বেঙ্গালুরু-চেন্নাই এক্সপ্রেসওয়ে ওই দুটি রাস্তার মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে যাবে। এক্সপ্রেসওয়ের জন্য জমি অধিগ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে।

বিয়েট দ্বারকা, ওখা ব্রিজ

গুজরাটের মূলভূমির ওখার সঙ্গে বিয়েট-দ্বারকা দ্বীপকে জোড়ার জন্য শুরু হয়েছে ওখা ব্রিজের নির্মাণ। ৪ লেনের এই ব্রিজের দৈর্ঘ্য ২.৩২ কিলোমিটার। চলতি বছরের শুরুতে (১.১.১৮) এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রকল্পটির রূপায়ণে খরচ হবে ৬৮৯.৭ কোটি টাকা। সময় লাগবে ৩০ মাস।

অত্যাধুনিক যাত্রী পরিবহণ

শুধু রাস্তা তৈরি নয়। যাত্রী পরিবহণেও আচ্ছে দিন আনার জন্য দায়বদ্ধ নরেন্দ্র মোদী সরকার। নীতীন গড়করি সেই ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট। যাত্রী পরিবহণে কী ধরনের অত্যাধুনিক ব্যবস্থা মোদী সরকারের আমলে নেওয়া হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হলো।

ইন্ডিয়ান ব্রিজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আই বি এম এস)

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের জাতীয় সড়কগুলিতে যেসব ব্রিজ এবং কালভার্ট আছে সেগুলিকে তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা ব্রিজ ও কালভার্টগুলি পরীক্ষা করে তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। ১,৬২,০০০ ব্রিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ। জানা গেছে তার মধ্যে ১৪৭টি ব্রিজের অবস্থা খুবই খারাপ। অবিলম্বে সংস্কার প্রয়োজন। সরকার সেইমতো সংস্কারের কাজ শুরু করেছে।

সেতু ভারতম

অনাবশ্যক ট্রাফিক জ্যাম আটকাতে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত জাতীয় সড়ক থেকে জেব্রাক্রসিং তুলে দেওয়া হবে। সেই জায়গায় তৈরি হবে রোড ওভারব্রিজ। এই প্রকল্পের নাম সেতু ভারতম। এই প্রকল্পের আওতায় ২০৮টি জেব্রাক্রসিং (যেগুলি এন এইচ ডি পি-র অন্তর্ভুক্ত নয়) চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে ওভারব্রিজ/আন্ডারপাস বানানো হবে। খরচ পড়বে ২০,৮০০ কোটি টাকা। ২০৮টির মধ্যে ১২৭টি জেব্রাক্রসিং সম্পর্কিত বিস্তারিত রিপোর্ট এসে গেছে। যার মধ্যে ৭৮টির (আনুমানিক

ভদোদরা-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ে

দীনদয়াল উপাধ্যায় বন্দর

খরচ ৬৪২৮.৫৭ কোটি টাকা) অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। কাজ শুরু হয়েছে ৩৫টির।

এছাড়াও বহু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যার ফলে যাত্রী পরিষেবার মান আগের থেকে ভালো হবে। পথ দুর্ঘটনা রোধেও সরকার তৎপর। ২০১৬ সালে দুর্ঘটনা ৪.১ শতাংশ কমেছে। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই হ্রাস ৫.২ শতাংশ। সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী অসম বিহার ওড়িশা এবং উত্তরপ্রদেশ ব্যতীত দেশের অবশিষ্ট অংশে দুর্ঘটনা কমেছে।

ভারতমালা পরিযোজনা

এটি একটি আমব্রেলা প্রকল্প। এর উদ্দেশ্য দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় যেসব পরিকাঠামোগত ত্রুটি রয়েছে সেগুলির সংশোধন। সেই সঙ্গে যানজটহীন সড়ক-ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং প্রধান অর্থনৈতিক অঞ্চল, তীর্থস্থান, পর্যটনকেন্দ্র, জনজাতি-অধ্যুষিত এলাকা, সীমান্তবর্তী অঞ্চল, উপকূলবর্তী অঞ্চল, বাণিজ্য কেন্দ্র এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে এক সূত্রে বাঁধা। এই প্রকল্পের কাজ দুটি পর্যায়ে হবে। প্রথম পর্যায়ে মোট ২৪,৮০০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে ৫০০০ কিলোমিটার ন্যাশনাল করিডোর, ৯,০০০ কিলোমিটার অর্থনৈতিক করিডোর, ৬০০০ কিলোমিটার ফিডার/ইন্টার-করিডোর, ২,০০০ কিলোমিটার সীমান্তবর্তী সড়ক, ২০০০ কিলোমিটার উপকূলবর্তী ও বন্দরগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তা এবং ৮০০ কিলোমিটার গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে। এই প্রকল্পের আনুমানিক খরচ ৫,৩৫,০০০ কোটি টাকা। প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবে ২০২২ সালে।

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP করুন, উন্নতি করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)
২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
কোলকাতা . হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com
9830372090
9748978406

মোদীর ভারত নির্মাণ কর্মসূচির স্বপ্নের দিশারী বন্দর ও জাহাজ মন্ত্রক

সাগর বন্দর, পশ্চিমবঙ্গ

অভিমন্যু গুহ।। নীতীন গড়করির বন্দর ও জাহাজ মন্ত্রকের জন্য গত আর্থিক বাজেটে (২০১৭-১৮) বিগত বছরের তুলনায় বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পেও কেন্দ্র বৃহৎ বন্দরগুলির জন্য ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ছোটো বন্দরগুলির জন্য ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন আগামীদিনে ভারতীয় বাণিজ্য সমুদ্র-পথ যে শুধু নিয়ন্ত্রণ করবে তা-ই নয়, ভারতীয় বাণিজ্যের চালিকাশক্তিও হয়ে উঠবে এটি। আর এ-কাজ বন্দরগুলির উন্নয়ন বা নাব্যতা বৃদ্ধির মতো অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্রও ভাবিত। একশো শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এই সম্ভাবনাময় প্রকল্পের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের ভারত নির্মাণ কর্মসূচি অনেকাংশে বন্দর ও জাহাজ মন্ত্রকের ওপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন তথ্যে তা তুলে ধরা হলো :

বন্দর ও জাহাজ
এক নজরে

(১) ভারতে ১২টি বৃহৎ বন্দর ও ৬৪টি ক্ষুদ্র বন্দর রয়েছে জাহাজ-বাহিত পণ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য।

(২) ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে এই বৃহৎ বন্দরগুলিতে পণ্য ওঠানো- নামোনো হয়েছে ১০৬৫.৮৩ মিলিয়ন টন।

(৩) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচের বিনিময়ে ৫৭টি প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল, যার ফলে বন্দরগুলিতে বছরে ১০৩.৫২ মিলিয়ন টন অতিরিক্ত পণ্য-ওঠানো-নামানো সম্ভব হয়।

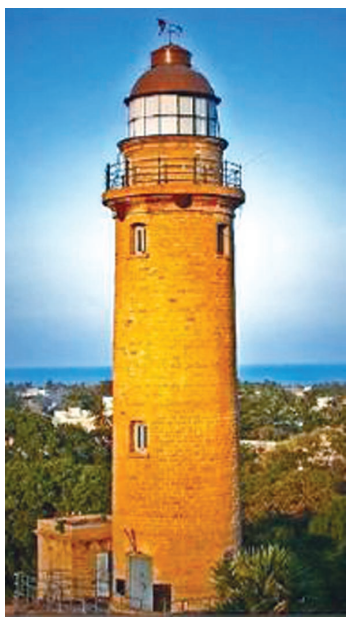

লাইটহাউস

(৪) এই বন্দরগুলিতে সুষ্ঠু ভাবে পণ্য-পরিবহণের জন্য ২০১৮-১৯ সালে কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রক ২৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ বরাদ্দ করেছে।

বন্দর ও জাহাজ
বিনিয়োগের কারণ :

(১) ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট পলিসি কমিটির রিপোর্ট মোতাবেক ২০২১-২২ সালের মধ্যে জাহাজ-বাহিত পণ্য পরিবহণের পরিমাণ বছরে ১৬৯৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন ছুঁয়ে ফেলবে। ২০১৪-১৫ সালে এই পরিমাণ ছিল বছরে মাত্র ৬৪৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

(২) ২০২১-২২ সালের মধ্যে বছরে ২৪২২ মিলিয়ন মেট্রিক টন পণ্য বিভিন্ন ভারতীয় বন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে।

(৩) এর ফলে আগামী ছয়-সাত বছরের মধ্যে আমাদের বন্দরগুলির অতিরিক্ত পণ্য পরিবহণ ক্ষমতা বছরে অন্তত আরও ৯০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন বাড়াতে হবে।

(৪) কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রকের উদ্যোগে সামুদ্রিক উন্নয়ন-নীতি বা ন্যাশনাল মেরিটাইম ডেভেলপমেন্ট পলিসি (এন এম

স্টিমার চলাচলের জলপথ

ডি পি) গৃহীত হয়েছে। একাজে বাজেট ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(৫) আগামী পাঁচ-বছরে বন্দর-প্রকল্পে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করতে চায় কেন্দ্র।

(৬) শিল্প-শহর ও শিল্প-এলাকাগুলি ঘিরে থাকা বন্দরের উন্নয়নে বিশেষ নজর।

(৭) ২১টি শুষ্ক বন্দর প্রকল্পের কাজ চলছে। এই বন্দরগুলি প্রাণ ফিরে পেলে ভারতে নৌ-বাণিজ্যের চেহারাই পাল্টে যাবে।

(৮) জাহাজ-বাহিত কিছু বিশেষ পণ্যের জন্য স্বতন্ত্র 'টার্মিনাল' তৈরির পরিকল্পনা। যেমন তরল প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে আলাদা টার্মিনাল নির্মাণ।

(৯) 'গ্লোবাল ভ্যালু চেন'-এ ভারতের অস্তিত্ব ক্রমশ জোরালো হওয়ার উন্নততর বন্দর পরিকাঠামো আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

বন্দর ও জাহাজ
কিছু তথ্য

(১) ১২টি বৃহৎ ও ২০৫টি নাতিবৃহৎ বন্দর রয়েছে মোট ৭৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল ঘিরে।

(২) পরিমাণের নিরিখে দেশের বাণিজ্যের ৯০ শতাংশ ও অর্থের বিচারে ৭০ শতাংশ বাণিজ্যই সামুদ্রিক পরিবহণের দ্বারা হয়।

(৩) বন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও ক্ষমতা বাড়ানোর দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। যার সুফল মিলেছে হাতে-নাতে। ২০১২-১৩ সালে ৭৪৪.৯১ মেট্রিক টন পণ্য ওঠানো-নামানোর ক্ষমতা ২০১৬-১৭ সালে এসে ১০৬৫.৮৩ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে।

(৪) ২০১৬-১৭ সালে বৃহৎ বন্দরগুলিতে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলের ক্ষমতা ৬৪৮.৪০ মিলিয়ন টন। ২০১৪-১৫-র তুলনায় এই বৃদ্ধি প্রায় ১১ শতাংশ।

(৫) নাতিবৃহৎ বন্দরগুলির ক্ষেত্রে অবশ্য এই পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলের ক্ষমতা একই রয়েছে— ৪৮৫.২১৩ মিলিয়ন টন।

(৬) পণ্য দ্রুত নামানো-ওঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও অনেকটা কমছে, যেমন একটি জাহাজের ক্ষেত্রে ২০১৫-১৬ সালে গড়ে এই সময় ছিল ৮৭.৩৬ ঘণ্টা, ২০১৬-১৭ সালে তা হয়েছে ৮২.৫৬ ঘণ্টা। ২০১৭-১৮-তে ৬৩.৩৩ ঘণ্টা।

(৭) দিনপ্রতি জেটিতে পণ্যবাহী জাহাজ সংযুক্ত করার পরিমাণও ২০১৫-১৬-র ১৩ হাজার ১৫৬ টন থেকে বেড়ে ২০১৬-১৭-য় ১৪ হাজার ৫৮৩ টন হয়েছে। এবং ২০১৭-১৮-য় তা ১৪ হাজার ৯১২ টনে পৌঁছে গিয়েছে।

(৮) ২০১৬-১৭-য় ৫৭টি প্রকল্পে ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগে বন্দরগুলিতে অতিরিক্ত ১০৩.৫২ মিলিয়ন টন পণ্য নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছিল, ২০১৭-১৮-য় এরকম আরও ৫৯টি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

(৯) বন্দর-কেন্দ্রিক উন্নয়নে সাগরমালা প্রকল্পের অন্তর্গত ১৪২টি স্বতন্ত্র প্রকল্পে বাজেট ১৪.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(১০) এপ্রিল ২০১৭ থেকে জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বন্দরগুলিতে পণ্য ওঠানো-নামানোর তুলনামূলক পরিমাণ— পেট্রল, তেল ও তৈলজাত পদার্থ (৩৩.৭৪ শতাংশ), এগুলি রাখার পাত্র (১৯.৭০ শতাংশ), শিল্পজাত কয়লা (১৩.৭২ শতাংশ), অন্যান্য (১২.০৯ শতাংশ), রান্নার কয়লা (৭.৬০ শতাংশ), আকরিক লোহা ও কাগজের তাল (৬.৭২ শতাংশ), অন্যান্য তরল পদার্থ (৪.১৫ শতাংশ), কীটনাশক ও সার (১.১৭ শতাংশ)।

(১১) দেশের বারোটি বৃহৎ বন্দর ৫৭ শতাংশ পণ্য পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ করে।

বন্দর ও জাহাজ
সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ নীতি :

(১) এই ক্ষেত্রের সামগ্রিক ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র একশো শতাংশ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের নীতি নিয়েছে।

(২) বন্দরগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন এবং নির্মাণের ব্যাপারেও একশো শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বন্দর ও জাহাজ
বিদেশি বিনিয়োগকারী

(১) এ পি সোলার মিয়ারকস (ডেনমার্ক)।

(২) পি এস এ সিঙ্গাপুর (সিঙ্গাপুর)।

(৩) দুবাই পোর্টস ওয়ার্ল্ড (আরব আমীরশাহী)।

(৪) জান দেল নাল এন ভি (বেলজিয়াম)।

(৫) হুন্ডাই ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন লিমিটেড (দক্ষিণ কোরিয়া)।

(৬) রয়্যাল বসকালিস ওয়েস্টমিনিস্টার এন ভি (নেদারল্যান্ড)।

পাপহারী দশহরা একটি জাতীয় উৎসব

নন্দলাল ভট্টাচার্য

শেষ হলো প্রতীক্ষা। সফল হলো রাজা ভগীরথের সাধনা। স্বর্গের গঙ্গা নেমে এলেন মর্ত্যে। শুধু ভগীরথের পূর্বপুরুষ কপিলমুনির রোষদৃষ্টিতে ভস্মীভূত রাজা সগরের ষাট হাজার পুত্রের মুক্তির জন্য নয়, সমস্ত মর্ত্যবাসীর পাপহরণের উদ্দেশ্যেই প্রবাহিতা হলেন ভারতের পুণ্যভূমিতে।

ত্রিপথগামিনী গঙ্গার মর্ত্যে আগমনের দিনটি ছিল জ্যৈষ্ঠের শুক্লাদশমী। দিনটি ছিল হস্তা নক্ষত্রযুক্ত। মানুষের দশরকম পাপ হরণ করার জন্যই তাঁর এই অবতরণ। আর সে কারণেই দিনটি দশহরা হিসেবে পালিত হয় এই ভারতভূমে। ব্রহ্মপুরাণে আছে, 'হরতে দশ পাপানি তস্মাদ্দশহরা স্মৃতা।' দিনটি যদি হস্তানক্ষত্রযুক্ত হয় তাহলে ওইদিন গঙ্গাস্নান করলে দশ জন্মের পাপ নাশ হয়।

স্কন্দপুরাণে আয়ত্ত আছে,—

জ্যৈষ্ঠে মাসি সিত পক্ষে দশম্যাং বুধহস্তয়োঃ।
ব্যতীপাতে গরানন্দে কন্যাচন্দ্রে বৃষে রবেট।
দশযোগে নরঃ স্নাত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।

এই বচন অনুযায়ী জ্যৈষ্ঠের শুক্লাদশমী তিথিটি যদি বুধবারে পড়ে এবং সেটি যদি হস্তানক্ষত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র মতো ব্যতীপাত, গরকরণ, আনন্দযোগ যুক্ত এবং চন্দ্র ও সূর্য যদি যথাক্রমে কন্যা ও বৃষ রাশিতে থাকে, তাহলে এদিন গঙ্গাস্নানে সবরকম পাপ বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ ওই দশটি যোগযুক্ত দশহরা তিথিটি মানুষকে সবরকম পাপ থেকেই উদ্ধার করে।

দশহরা তিথিতে গঙ্গাস্নান করলে দশটি পাপ বিনষ্ট হয়। শাস্ত্রকাররা বলছেন এই দশটি পাপের মধ্যে তিনটি কায়িক, চারটি বাচনিক এবং তিনটি মানসিক পাপ। কায়িক পাপের তালিকায় আছে অদত্ত বস্তু গ্রহণ অর্থাৎ না বলে পরের জিনিস নেওয়া, অবৈধ প্রাণী বধ এবং পরস্ত্রী গমন। বাচনিক পাপ হলো, নিষ্ঠুর ভাষণ, মিথ্যেকথা বলা, পৈশূন্য অর্থাৎ গুরু প্রমুখের কাছে অর্থ উপার্জনের জন্য অন্যের প্রতি দোষারোপ বা লাগানি ভাঙানি করা এবং অসম্বন্ধ প্রলাপ অর্থাৎ আবোল-তাবোল বলা। অন্যদিকে, মানসিক তিনটি পাপ হলো পরশ্রীকাতরতা বা পরের জিনিস কামনা করা, পরের অনিষ্ট চিন্তা করা এবং মিথ্যায় আসক্তি। এই দশ রকম পাপই মানুষকে তার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করে। তাই সবসময় ওই দশরকম পাপাচার থেকে বিরত থাকতে হয়। সেটাই আদর্শ জীবন যাপনের উপায়। দশহরায় গঙ্গাস্নানের মাধ্যমে এই দশরকম পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনে এগুলি থেকে দূরে থাকারও ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই জাতীয় পাপ মানুষের মানসিক স্থৈর্য ও শান্তি নষ্ট করে। সে কারণেই এগুলি থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে হিন্দুশাস্ত্রে।

দশহরার দিন গঙ্গাস্নান ছাড়াও গঙ্গাতীরে সোনা, রুপো বা মাটি দিয়ে তৈরি গঙ্গামূর্তির পুজো করা হয়। এদিন বহু বাড়িতেই অষ্টনাগের সঙ্গে মনসাদেবীর পুজো করা হয়। পুজোয় মনসাদেবীকে দশরকম ফল দেওয়া হয়ে থাকে

প্রসঙ্গত বলা দরকার, জীমূতবাহন, বৃহস্পতি, রায়মুকুট, শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি, রঘুনন্দন প্রমুখ বঙ্গীয় স্মৃতিকারা গঙ্গাস্নান বা গঙ্গা মাহাত্ম্যের কথা বললেও, গঙ্গাপূজার কথা কেউ বলেননি। যে কারণে অনেকে মনে করেন, বঙ্গদেশে দশহরার দিনে গঙ্গাপূজার নির্দেশ খুব একটি প্রাচীন নয়। সম্ভবত পরবর্তীকালে পুরোহিত সমাজ এই পূজার

নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যাপারটা যাই হোক, এককালে মকরবাহিনী গঙ্গার মাটির মূর্তি করে পুজো করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। তবে নানা কারণে, এই পুজোর প্রচলন এখন অনেকটাই কমে গিয়েছে। সে কারণেই এক সময় দিনটি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পরিগণিত হলেও, এখন আর দিনটিতে ছুটি দেওয়া হয় না।

ভগীরথই গঙ্গাকে আনেন এই মরভূমিতে দশহরা তিথিতে। কেউ কেউ বলেন, এই তিথিতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাজা ভগীরথ। ব্যাপারটা যাইহোক, গঙ্গার মর্ত্যে আগমনের কাণ্ডারি ছিলেন ভগীরথ আর সে কারণেই চলতি কথায় দিনটি ভগীরথ দশরা বা দশেরা নামে পরিচিত। গঙ্গার মর্ত্যাবতরণ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দিনটি গঙ্গাদশেরা নামেও পরিচিত। উল্লেখ্য, বিজয়া দশমীকে শুধুই দশরা বা দশেরা বলা হয়। আর বিজয়াদশমীর পরবর্তী কয়েকদিনকে বলা হয় বারদশরা।

দশহরা শুধু বঙ্গদেশে নয়, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং বিহারেও পালিত হয় যথেষ্ট আড়ম্বর উদ্দীপনার সঙ্গে। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গা যেসব রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়েছে, সেইসব জায়গাতেই এই দশহরা উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। এর বাইরে ত্রিপুরাতেও কিন্তু এই গঙ্গা দশহরা পালন করা হয় বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে। সেখানে নদীতে বাঁশের মণ্ডল বা মন্দির তৈরি করে ওই দিন গঙ্গাপুজো করা হয় মহামারী রোধ ও প্রসূতিদের কল্যাণের জন্য। মূলত আদিবাসী সম্প্রদায় এই পুজো করেন।

গঙ্গাদশেরা উপলক্ষে উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহারে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে গঙ্গাপুজো ও আরতি হয়। হরিদ্বার, হৃষীকেশ, বারাণসী, গড়মুক্তেশ্বর, এলাহাবাদ, পাটনা এই উৎসবের মূল কেন্দ্র। গঙ্গাস্নান এবং গঙ্গার আরতি শেষে নদী জলপ্রবাহে প্রদীপ ভাসিয়ে পালন করা হয় এই উৎসব। ২০১৭ সালেও হরিদ্বারে প্রায় ১৫ লক্ষ পুণ্যার্থী দিনটি পালন করেন। বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটেও একই ভাবে অসংখ্য ভক্তপ্রাণ মানুষ এই দিনটি পালন করেন গঙ্গাস্নান, গঙ্গাপূজা এবং গঙ্গার আরতির মাধ্যমে।

ওই দিন গঙ্গা পুজোর সঙ্গে যমুনারও অর্চনা করা হয় উত্তর ভারতে। ঘুড়ি ওড়ানো সেখানে উৎসবেরই একটি বড়ো অঙ্গ। মথুরা, বৃন্দাবন, বটেশ্বর প্রভৃতি জায়গায় যমুনায় স্নান, অর্ঘ্যদান ও দীপদান করা হয়। এখানে তরমুজ এবং শসা ভাসানো হয় যমুনায় নৈবেদ্য হিসেবে। তাছাড়া এই দিনে সাধারণের মধ্যে ঘোল, সরবত ইত্যাদি ঠাণ্ডা পানীয় বিতরণ করা হয়। গ্রীষ্মের দিনে এভাবে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণকে এই পুজার একটি অঙ্গ হিসেবেই গণ্য করা হয়। অর্থাৎ পূজা এবং সেবা এখানে একাকার।

নবান্নের পরই দশহরা কৃষিপ্রধান দেশ ভারতের একটি অন্যতম বড়ো উৎসব। বস্তুত এরপরই বর্ষার আগমনে শুরু হয় আমন ধানের চাষ। তাই এই উৎসব জাতীয় জীবনের একটি অর্থবহ গুরুত্বপূর্ণ দিন। দেশের কৃষি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও দ্যোতক এই দশহরা।

বঙ্গদেশে দশহরা কেবল জ্যৈষ্ঠের শুক্লা দশমীতে পালন করা হলেও উত্তর ভারতে দিনটি পালন করা হয় দশদিন ধরে। দশহরার ন' দিন আগে সূচনা হয় এই উৎসব অনুষ্ঠান। দশহরার দিনে এর সমাপ্তি গঙ্গাপূজা এবং আরতির মধ্য দিয়ে। ■

চাকদহ ও দেবগ্রাম

জলজ বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীয়া জেলার প্রাচীন স্থান চাকদহ এককালে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছিল। বিভিন্ন পালাপার্বণে চাকদহের গঙ্গায় স্নানের জন্য এবং শবদাহ করতে দেশ-দেশান্তর থেকে লোকজন আসত। যদিও এখন গঙ্গা ছয় কিলোটিটার দূরে সরে গেছে।

চাকদহের প্রাচীন নাম একাধিক : চক্রদহ, চক্রতীর্থ, প্রদ্যুম্ননগর, ঋক্ষবন্তনগর ও আচম্বিতা। এহেন চাকদহকে ঘিরে দুটি কিংবদন্তি শোনা যায়। যথা— মর্ত্যে গঙ্গাকে আনার সময় ভগীরথের রথের চাকায় এখানে যে গভীর খাতের সৃষ্টি হয়, তা পরবর্তী সময়ে গঙ্গাজলে পূর্ণ হলে জায়গাটির নাম হয় চক্রদহ। আবার শ্রীকৃষ্ণের ছেলে প্রদ্যুম্ন পুরাকালে বঙ্গভূমির অধিপতি সম্বরাসুরকে চক্র দিয়ে বধ করে, এই স্থানে তাঁর রক্তমাখা চক্র ধুয়ে ফেলেন। তখন চক্র ধোয়ার জায়গায় এক প্রকাণ্ড গর্তের সৃষ্টি হয়। সেই গর্ত বা চক্রটিতে দহ থেকে নাম হলো চক্রদহ। পক্ষান্তরে, প্রদ্যুম্ন চক্রতীর্থে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে নিজের নামে একটি নগর স্থাপন করেন। চক্রতীর্থের নামকরণ হয় প্রদ্যুম্ননগর। আজও চাকদহ থেকে যে মজা খালটি (মূলত গঙ্গার আদি খাত) পালপাড়া হয়ে শিমুরালির দিকে চলে গেছে, তার নামও প্রদ্যুম্ন সরোবর।

চাকদহের মতো দেবগ্রামও কিংবদন্তিময় স্থান। তবে নদীয়া জেলায় দুটো দেবগ্রাম আছে। আমরা যে দেবগ্রামের কথা বলছি, তার অবস্থান রানাঘাট-বনগ্রাম রেলপথের গাংনাপুর স্টেশন থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে। গ্রামটি আদ্যিকালের। সেখানে দেবপাল নামে এক কুমোর বংশীয় রাজার পুরনো গড়ের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। সেই সঙ্গে রয়েছে কয়েকটি ঢিবি আর পুকুর। শোনা যায়, রাজা দেবপাল প্রথম জীবনে এক গরিব কুমোর ছিলেন। মধ্য বয়সে তিনি জনৈক সন্ন্যাসীকে ঠকিয়ে তাঁর পরশমণি চুরি করেন। সেই পরশমণির দৌলতে তিনি অচিরেই রাজ্যসম্পদ লাভ করে, রাজসিংহাসনে বসেন। কিন্তু সন্ন্যাসী তাঁকে অভিশাপ দেন, শীঘ্রই রাজার বিনাশ হবে। এর কিছুদিন পরেই নদীয়ারাজ রাঘব দেবপালের রাজ্য আক্রমণ করেন। দেবপাল যুদ্ধযাত্রার সময় রানিদের নির্দেশ দিয়ে যান, যদি তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন, তাহলে, তাঁর পোষা পায়রা রাজধানীতে ফিরে আসবে। পায়রা দেখলেই রানিরা যেন সম্মানরক্ষার্থে আত্মবিসর্জন দেন।

তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। একদিন শেষও হলো। এ যুদ্ধে দেবপাল সসম্মানে জয়লাভ করলেন। কিন্তু অনবধানতাবশে তাঁর পায়রা রাজধানীতে উড়ে চলে গেল। পায়রার প্রত্যাগমন দেখে রানিরা একযোগে খিড়কি পুকুরের জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করলেন। যুদ্ধক্লান্ত দেবপাল ফিরে এসে এই দুঃসংবাদ শুনে দিশাহারা হয়ে নিজের পেটে তরবারি ঢুকিয়ে দিলেন। অবশেষে নদীয়ারাজ রাঘব তাঁর রাজ্য দখল করলেন। ■

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

লিন্ডা জন্‌সন : (১৯৪৪-)

পরিচিতি : ইনি হলেন আমেরিকার বিখ্যাত গবেষক। তিনি অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, দ্য কমপ্লিট ইডিয়ট্‌স গাইড টু হিন্দুইজম।

উদ্ধৃতি : হিন্দুর মতো প্রাচ্যের ধর্মগুলির বিজ্ঞানের মুখোমুখি হওয়ার সামর্থ্য আমাদের মুগ্ধ করে। এমনকী হিন্দুধর্ম নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আয়ু এবং তার আয়তন। আজ সারা বিশ্বে হিন্দুধর্মই একমাত্র দর্শনশাস্ত্র যাতে গ্রথিত আছে বিশ্বজনীনতার মূলসূত্রগুলি।

উৎস : 'দ্য কমপ্লিট ইডিয়টস গাইড টু হিন্দুইজম'—লিন্ডা জন্‌সন।

উদ্ধৃতি : সমগ্র বিশ্বে হিন্দুধর্মই একমাত্র ধর্ম যা নির্বিশেষে সমস্ত ধর্মবিশ্বাসকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ এই ধর্ম বিশ্বাস করে যে, কোনও ব্যক্তি বা বস্তুই পরমব্রহ্মের থেকে পৃথক নয়।

উৎস : 'দ্য কমপ্লিট ইডিয়টস গাইড টু হিন্দুইজম'— লিন্ডা জন্‌সন।

হু শি : (১৮৯১-১৯৩২)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন আমেরিকাস্থিত চীনের রাষ্ট্রদূত (১৮৩৮-১৯৪২)। ইনি চীনের একজন বিখ্যাত গবেষক, লেখক ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদেও নিযুক্ত ছিলেন (১৯৪৬-১৯৪৮)। পরবর্তীকালে তাইওয়ানের, 'অ্যাকাডেমিয়া সিনিকা'র সভাপতি হিসাবে কাজ করেন।

উদ্ধৃতি : প্রায় কুড়ি শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ভারত একটি সৈনিক না পাঠিয়েও, চীনের উপর সাংস্কৃতিক ভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

উদ্ধৃতি : এর পূর্বে চীনদেশ কখনই জানতে পারেনি যে হিন্দুধর্মের মতো এমন এক মহান ও ঐশ্বর্যশালী ধর্ম পৃথিবীতে আছে, যা মননশীলতায় সমৃদ্ধ এক চিত্তাকর্ষক আচার-অনুষ্ঠানে পূর্ণ। আর তার মধ্যে আছে নির্ভুল এবং মহান মহাজাগতিক এবং আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার কথা। দীপ্তিবিচ্ছুরণকারী মহামূল্যবান রত্নপূর্ণ বর্ণাঢ্য অট্টালিকার সম্মুখে অকস্মাৎ আগত এক ভিক্ষুকের মতো চীনও ভারতের সামনে বিস্মিত, হতবাক, আবিষ্ট এবং উল্লসিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। চীন এই মুক্তহস্ত মহান দেশের কাছে যথেচ্ছভাবে আধ্যাত্মিক সম্পদ গ্রহণ করেছিল। ভারতের কাছ থেকে চীনের এই ঋণ বর্ণনার অসাধ্য।

উৎস : ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন— ডি.পি. সিংহল।

হিউস্টোন স্মিথ : (১৯১৯-)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন আমেরিকার অন্যতম গবেষক ও লেখক। তাঁর লিখিত অসামান্য পুস্তকটি হলো, 'দ্য ওয়ার্ল্ড রিলিজিওন' যা ১৪টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং ২০ লক্ষেরও বেশি কপি বিক্রি হয়েছিল। তিনি দীর্ঘদিন ডেনভার এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

উদ্ধৃতি : হিন্দুদের আবিষ্কৃত বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্বটি ছিল ব্যাপ্তি ও গভীরতায় বিস্ময়কর। তাঁরা কিন্তু সেখানে থেমে থাকেনি। তারা আরও অগ্রসর হয়ে সবচেয়ে স্পর্ধাপূর্ণ আবিষ্কার করেছিল যে আমরা নিজেরা হচ্ছি অনন্ত অসীম, যা থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ এ পর্যন্ত যা ধারণা করতে সক্ষম হয়েছে, তার মধ্যে এটিই হচ্ছে সবচেয়ে সাহসী সিদ্ধান্ত। হিন্দু ধর্মের সব কিছুই সঠিক দিশা নির্দেশ করে।

উদ্ধৃতি : পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকরা যখন পৃথিবীর বয়স সম্ভবত ৬০০০ বৎসর বলে ভাবছিল, তখন ভারতের ঋষিরা গঙ্গার তীরে বালুকণিকার ন্যায় নক্ষত্রপুঞ্জ এবং মহাকালব্যাপী যুগ-মহাযুগের কথা বলেছেন। নিখিল বিশ্বের গভীরতা এতই অসীম যে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ পর্যন্ত না তুলেই তার মধ্যে হারিয়ে যায়।

উৎস : মিস্টিক জার্নি— ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ইনফাইনাইট— হিউস্টোন স্মিথ।

স্যার উইলিয়াম জোনস্ : (১৭৪৬-১৭৯৪)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন বিখ্যাত গবেষক, ভাষাবিদ এবং আইনজ্ঞ। উনি অনেক পুস্তকের রচয়িতাও ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশকে ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ইনিই প্রথম করান। যখন তিনি সংস্কৃতশাস্ত্রের বিখ্যাত নাটক 'শকুন্তলার' ইংরেজি অনুবাদ (১৭৮৯) সম্পন্ন করেন, তা পড়ে পাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিত যেমন জোহান গোয়েথ গট্‌ফ্রিড হার্ডার, ফ্রেডেরিক শিলার প্রমুখ অত্যন্ত উল্লসিত, মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি সংস্কৃত 'গীতগোবিন্দ' (১৭৮৯), 'মনুসংহিতা (১৭৯৪) এবং 'ঋতুসংহারে'র ভাষান্তরের কাজও সম্পন্ন করেন।

উদ্ধৃতি : নিউটনের অবিস্মরণীয় গৌরবের এতটুকু হানি না করে, আমি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে জোর গলায় বলতে পারি, যে তাঁর রচিত দর্শন এবং ধর্মের সমস্ত কিছুই পাওয়া যায় বেদের মধ্যে।

উৎস : দ্য ওনলি অথেন্টিক হিস্ট্রি অব্ দ্য থিয়োসফিকাল সোসাইটি —হেন্‌রি স্টিল অল্‌কট।

উদ্ধৃতি : একজন মানুষ তার সারা জীবন দিয়ে হিন্দুধর্মশাস্ত্রের অধিকাংশ পড়ে শেষ করতে পারবে না।

উৎস : ল্যাঙ্গুয়েজ ইন কন্টেমপোরারি ইন্ডিয়া— সুরেশ কে.শর্মা।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি।
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী, নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

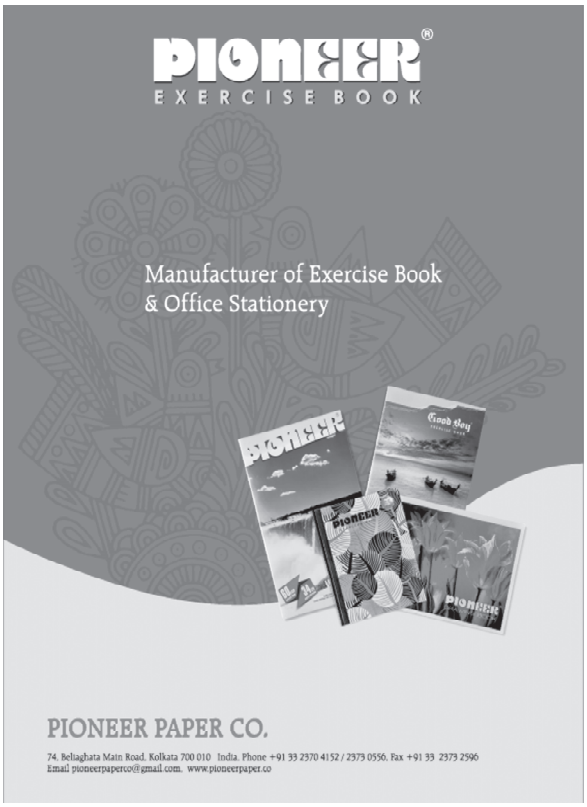

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

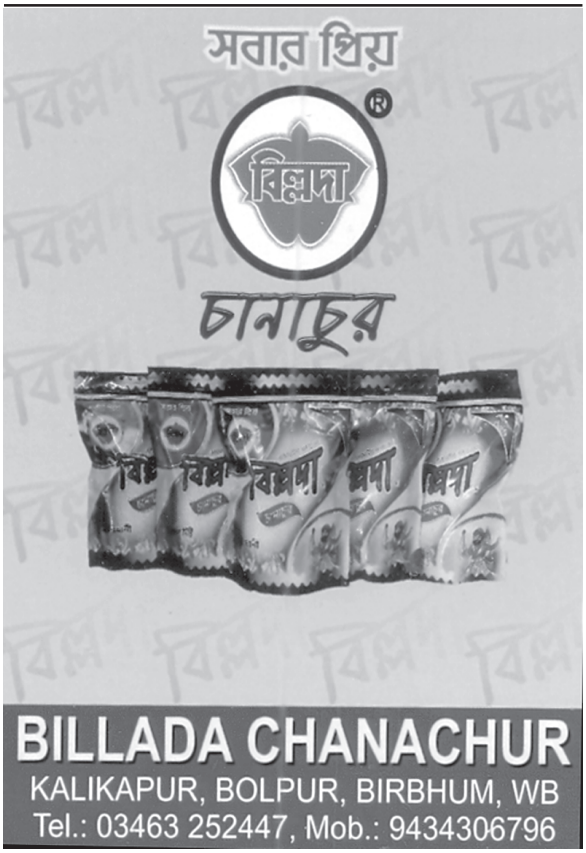

প্রাক্-স্বাধীনতাকালীন বাংলা কবিতা ও গানে স্বদেশভাবনা

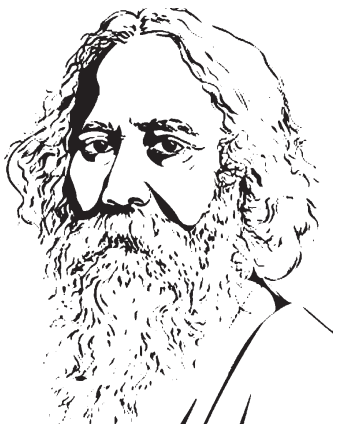

গৌতম কুমার মণ্ডল

এরকম একটি সাধারণ ধারণা আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে, আমাদের স্বদেশবোধ ও দেশপ্রেমের ভাবনা নাকি ইংরেজরা ভারতে আসার পরই জাগ্রত হয়। ইংরেজ আগমনের পূর্বে আমাদের মধ্যে নাকি ভারতবোধই গড়ে ওঠেনি। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় কথাটি সত্যি নয়। ইংরেজ আগমনের অনেক আগে থেকেই আমাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক দিক থেকে একটি বৃহত্তর ভারতভাবনা ছিল। আমাদের প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারত। এই নামটিই আমাদের অতি প্রাচীন ভারতভাবনার সব থেকে বড় প্রমাণ। এই বৃহৎ ভূখণ্ডের বহু মানুষ যুগ-যুগান্ত ধরে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য এই ভারতের কোথায় যেতেন? যেতেন কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির, প্রয়াগের সংগমস্থান, শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম, দক্ষিণের তিরুপতি-বালাজির মন্দির— এইসব পবিত্র জায়গাগুলিতে। তীর্থযাত্রা, পুণ্যসঞ্চয়, ন্যায়চর্চা, বিদ্যাচর্চা, নৃত্যশিক্ষা এইসব ক্ষেত্রে এই ভূখণ্ডের মানুষেরা একধরনের ঐক্য অনুভব করতেন। এই ঐক্যের নামই দেশ। যাঁর মনের মধ্যে এই ঐক্যের ভাবনা জাগ্রত হয় তাঁর স্বদেশ আছে। যাঁর মধ্যে এই ঐক্যের ভাবনা জেগে ওঠে না তাঁর স্বদেশ নেই— একথা বলা যেতেই পারে।

ইংরেজরা ভারতে আসার পর থেকে আমাদের স্বদেশবোধ ক্রমশ একটি রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করে। আমরা বুঝতে শিখলাম আমাদের স্বদেশকে এক বিদেশি শক্তি প্রতিদিন লুণ্ঠন করছে। মাতৃভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে স্বদেশের একটি মূর্ত ভাবনা গড়ে উঠল। স্বদেশ হলো দেশমাতা। এ দেশের জল, হাওয়া, মাটি, জনসমষ্টি, দেশের ভাষা, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সবকিছুই দেশের এই মাতৃরূপের সঙ্গে মিলে মিশে গেল। তা নিয়ে রচিত হতে থাকল গান, কবিতা। যেহেতু ইংরেজদের রাজধানী শহর কলকাতা, তাই বাংলা কবিতায় দেশের কথা প্রথমেই চলে এল। রামনিধি গুপ্তের 'স্বদেশীয় ভাষা' কবিতায় প্রথম স্বদেশ কথাটির ব্যবহার হলো—

'নানান দেশের নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা।
কত নদী সরোবর কী বা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা?'

বাংলা কবিতায় 'স্বদেশ', 'স্বদেশী' এই কথাগুলো এরপর ক্রমাগত আসতে থাকবে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই বাংলা কবিতায় স্বদেশভাবনার বিষয়টি আসতে শুরু করল। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) ছিলেন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যুবক। তিনি নিজেকে ভারতীয় বলেই গর্ববোধ করতেন। এমনকী তাঁর ছাত্ররাও তাঁকে বিদেশি বলে মনে করতেন না। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের— যাঁরা ইয়ং বেঙ্গল নামে পরিচিত হয়েছিলেন— যুক্তিবাদের শিক্ষা দিতেন। আর এসবের মধ্যেই থাকত তাঁর স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার বিষয়টি। ডিরোজিও কবিও ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ফকির অব জাঙ্গিরা'। ডিরোজিও-র একটি কবিতার অনুবাদ করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিতাটির নাম 'স্বদেশ আমার'। অনুদিত কবিতাটি এরকম—

''স্বদেশ আমার, কী বা জ্যোতির মণ্ডলী!

ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে!"

কবিতাটির ছত্রে ছত্রে আছে এই ভারতের সমৃদ্ধ অতীত চলে যাওয়ার জন্য কবির বেদনা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে (১৮১২-১৮৫৯) আমরা পুরাতনপন্থী কবি বলেই জানি। কিন্তু সাংবাদিক কবির কলমে অনেক সময়ই এসেছে দেশভাবনার সুর। বাংলাভাষার প্রতি এই কবির ছিল গভীর দরদ। বাংলা ভাষাতেই তিনি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সেই সময়ই তিনি দেখেছিলেন দেশের উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা বাংলা ভাষায় আর লিখছেন না। বেশ কিছুদিন পরে 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা'-য় বঙ্কিমচন্দ্রও এই একই আক্ষেপ প্রকাশ

করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের একটি ছোট কবিতা 'ভাষা'। কবিতার প্রথমেই তিনি বললেন—

'হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ।।
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা।
কোনো মতে নাহি তার জীবনের আশা।।'

বাংলা ভাষার প্রতি কবির এই ভালোবাসা তাঁর স্বদেশভাবনারই পরিচয় দেয়।

শুধু ভাষা নয়, দেশের দুরবস্থার প্রতিও ঈশ্বর গুপ্ত সচেতন ছিলেন। 'ভারতের অবস্থা' নামের একটি ছোট্ট কবিতায় দেশজননীর দুরবস্থা মোচনে দেশের তরুণ সমাজকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। তিনি লিখেছেন—

'জাগো জাগো জাগো সব ভারতকুমার।
আলস্যের বশ হয়ে ঘুমায়ো না আর।।
তোলো তোলো তোলো মুখ খোলো রে লোচন।
জননীর অশ্রুপাত করোরে মোচন।'

আমরা জানি উনিশ শতকের অনেক শ্রেষ্ঠ মানুষের মতোই ঈশ্বর গুপ্তও একধরনের স্ববিরোধিতায় ভুগতেন। এই ঈশ্বর গুপ্তই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সিপাহিদের নিয়ে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখেছেন। এই দ্বিধা বা ব্যঙ্গের মধ্যেও কবি ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে একটি স্বদেশপ্রাণ যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল তা তাঁর এরকম দু-একটি কবিতা থেকে জানা যায়।

প্রত্যক্ষত ডিরোজিওর না হলেও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন মধুসূদন। মধুসূদন পাশ্চাত্য সাহিত্যের মগ্ন পাঠক ছিলেন। একদিকে হিন্দু কলেজের উত্তরাধিকার অন্যদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যবোধ মধুসূদনের কবিমনে স্বদেশভাবনার বীজ বপন করে। তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য-এর মধ্যে দেশাত্মবোধের ভাবনা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। রাবণ- ইন্দ্রজিতের সোনার লঙ্কার প্রতি ভালোবাসা তাঁদের স্বদেশবোধেরই পরিচয় দেয়। তাঁর একাধিক সনেটে আছে দেশভাবনার কথা। জীবনের নানা ঝড়-ঝঞ্ঝায় অনুতপ্ত কবি লিখেছেন—

'রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো না গো তব মন কোকনদে।'

মধুসূদন তাঁর এ জাতীয় কবিতাগুলিতে নিজ ব্যক্তিগত দুঃখ, আশা আঙ্ক্ষাকে তাঁর দেশভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। ফলে স্বদেশ তাঁর কাছে কোনও বাইরের বিষয় নয়, তা একান্তই তাঁর অন্তরের বিষয়।

১৮৬৭ সালের ১২ এপ্রিল নবগোপাল মিত্র 'চৈত্রমেলা' নামের একটি জাতীয় মেলার সূচনা করেন। পরে এর নাম হয় হিন্দু মেলা। হিন্দু মেলাকে কেন্দ্র করে অনেক স্বদেশী সংগীত রচিত হয়। ১৮৬৮-র ১১ এপ্রিল মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ভারত সংগীত' ('মিলে সবে ভারত সন্তান,/একতান মন-প্রাণ,/গাও ভারতের যশোগান।।') গানটি গীত হয়। ১৮৬৯-এ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু মেলা-র সম্পাদক হন। ছাপার অক্ষরে রবীন্দ্রনাথের নামযুক্ত প্রথম কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' মেলায় পঠিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের গান 'মলিন মুখচন্দ্রমা তোমারি' এই মেলাতেই গাওয়া হয়। এভাবে হিন্দুমেলার কর্মকাণ্ড থেকেই জাতীয়তাবোধক গান ও কবিতা প্রবল হয়ে উঠল। এই সব গান ও কবিতা দেশের মুক্তি সংগ্রামে অনুঘটকের কাজ করল।

দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন সে যুগের মহিলারাও। উনিশ শতকে বাঙালি মেয়েদের দুরবস্থার কথা আমরা জানি। শিক্ষাহীনতা, অজস্র সামাজিক কুপ্রথা, স্বাস্থ্যহীনতায় দেশের অর্ধেক জনসমষ্টি তখন গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন। তাদের জন্মই যেন সন্তান উৎপাদন ও অবিরাম গৃহকর্মের জন্য। এই ঘন অন্ধকারের মধ্যেও মাঝে মাঝে দেখা গেছে আলোর রেখা। এই আলো শিক্ষার, সৃষ্টিশীলতার। উনিশ শতকেই এগিয়ে এসেছেন বেশ কয়েকজন বাঙালি মেয়ে যাঁরা দেশাত্মবোধক গান ও কবিতার মাধ্যমে তাঁদের অন্তরের আলোকেই বিচ্ছুরিত করতে চেয়েছেন। জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী দেবী কবিতা লিখতেন। তিনি 'উদ্বোধন' নামের কবিতায় বাঙালি যুবকদের দেশের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন— 'বঙ্গের ছেলে মেয়ে জাগো, জাগো, জাগো,/পরের করুণা কেন মাগো'। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা এ কাজে কয়েক কদম এগিয়ে ছিলেন। সে বাড়ির স্বর্ণকুমারী দেবী ও বিশেষ করে তাঁর কন্যা সরলাদেবী চৌধুরাণী দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা লিখেছেন প্রচুর। সরলাদেবী ভালো গায়িকা ও সুরকার ছিলেন। দেশ-অন্ত প্রাণ সরলাদেবীর একটি অতি পরিচিত গান হলো 'নমো হিন্দুস্তান'—(অতীত-গৌরববাহিনী মম বাণী! গাহো আজি হিন্দুস্তান!)। মেয়েদের মধ্যে আর উল্লেখযোগ্য দুটি নাম হলো গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও কামিনী রায়। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর বিখ্যাত গান 'শিবাজী উৎসব'—(আজি গাও-গাও-গাও খুলে মন প্রাণ/ভারতের কথা ভারতের গাথা। ভারত বীরের যশোগান।)।

স্বদেশবোধ একটি বিমূর্ত ধারণা। এই বিমূর্ত ধারণাটিকে প্রথম মূর্তরূপ দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) তাঁর বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' গানে। দেশ যেন মা। সে মায়ের আকার কেমন, তাকে দেখতে কেমন— দেবী দুর্গার সঙ্গে মিলিয়ে তার একটি কাব্যরূপ তৈরি করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। গানটি লেখা হয় ১৮৭৫-এর ৭ নভেম্বর। পরে গানটি 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসে স্থান পায়। আমাদের জাতীয় জীবনে 'বন্দে মাতরম্' গানের গুরুত্ব অনেক। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন— 'বন্দে মাতরম্ গান নহে— মন্ত্র'। এই মন্ত্র জপ করতে করতে স্বদেশের একটি চিন্ময়ী রূপ যেন মনের মধ্যে জেগে ওঠে। তাই বিশ শতকে অনেক বিপ্লবী এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে

করতেই ফাঁসির দড়িতে জীবন বিসর্জন দেন। একইসঙ্গে গানটি সম্পর্কে অনেক বিরোধ ও বিতর্ক আছে। তবু এই গান দেশের যুবসমাজকে দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ করে তুলেছিল। 'বন্দে মাতরম্' গানের একটি সর্ব ভারতীয় আবেদন ছিল যা উনিশ শতকে রচিত আর অন্য কোনও বাংলা গানের ছিল না। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে যাঁরা স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা এই গানকেই মন্ত্র করে নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও যেন এটাই চেয়েছিলেন। এ গানের ভাষা নিটোল বাংলা নয়; বাংলা ও সংস্কৃত মিলিয়ে। বাল গঙ্গাধর তিলক থেকে লালা লাজপত রায় সকলেরই ভারতকেন্দ্রিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই গান। মনে রাখা দরকার গানটির সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর স্বরলিপি তৈরি করেছিলেন তাঁরই ভাগিনেয়ী সরলাদেবী চৌধুরাণী। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গবিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই গান সারা বাংলাকে স্বদেশী ভাবনায় জাগিয়ে তোলে। একটি গানের যে কত শক্তি তা নানা সময়ে দেখিয়েছে 'বন্দে মাতরম্'।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বন্দে মাতরম্ গানে দেশমাতৃকার যে চিত্র আঁকলেন তা অবশ্যই কাল্পনিক; চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অনুমানেই যেন তা মূর্ত হয়ে ওঠে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতমাতা'র (১৯০৫) ছবি আঁকলেন যা দেশভাবনাকে যেন আরও প্রত্যক্ষ করে তুলল। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান আর অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা'র ছবি, অন্যদিকে বিবেকানন্দের সেই উদাত্ত আহ্বান— 'হে ভারত ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত' দেশের যুবসমাজকে জাগিয়ে তুলল। এই সময় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেনের মতো বিশিষ্ট কবিরা লিখলেন অজস্র স্বদেশী গান ও কবিতা যা দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে গতি দিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তখনকার জাতীয় কংগ্রেস যা করতে পারেনি রবীন্দ্রনাথের গান তাই করতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গাইতে বহু মানুষ নেমে এলেন রাস্তায়।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের যে গানগুলি সমগ্র বাঙালি জাতিকে জাগিয়ে তুলল সেগুলির কয়েকটি হলো—

১। 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল/ পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান'।

২। 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি/ তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী'।

৩। 'সার্থক জন্ম আমার, জন্মেছি এই দেশে/ সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে'।

৪। 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা'।

৫। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) দেশাত্মবোধক গানগুলি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির অংশ। যেমন তাঁর বিখ্যাত গান 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটি তাঁর 'শাহজাহান' নাটকের অংশ। এছাড়া তাঁর আরও দুটি বিখ্যাত দেশাত্মবোধক কবিতা হলো 'ভারতবর্ষ' (সেদিন সুনীল জলধি হইতে/ উঠিলে জননী—) এবং 'আমার দেশ' (বঙ্গ আমার! জননী আমার!/ ধাত্রী আমার! আমার দেশ,—)। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) লিখলেন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'। অতুল প্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) লিখলেন 'ভারতলক্ষ্মী', 'বলো বলো বলো সবে' কিংবা 'বাংলা ভাষা'র মতো বিখ্যাত কবিতা ও গান।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দেশমাতার যে ছবি আঁকলেন তাতে কিছু তফাত আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গানের মাতৃরূপ যেন পৌরাণিক, দৈব মহিমামণ্ডিত। বঙ্কিমের এই মাতৃরূপ গোটা ভারত চিনতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যে দেশমতার ছবি আঁকলেন তাঁর গানে ও কবিতায় তা একেবারে খাঁটি বাঙালিরূপ। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা বাঙালিকে ভরসা জোগায়, দেশের কাজে উৎসাহ উদ্দীপনা আনে। এগুলি যেন একেবারেই বাঙালির গান, বাংলার সুর, বাঙালির হৃদয়কে এগুলি স্পর্শ করে। বন্দে মাতরম্ গান সরকারি বিরোধিতার মাঝেও সারা ভারতের জাতীয় সংগীত হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের গানের এই ভারতব্যাপী আবেদন কম। স্বাধীন ভারতে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিলে এই গানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে গানটি লেখা হয়, পরে ব্রহ্মসংগীত হিসেবে এটি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দেশানুভবের সঙ্গে ঈশ্বরানুভব গানটির সঙ্গে মিশে আছে। তার মধ্যেও বন্দে মাতরম্ গানের ভাষা আর ভারতব্যাপী আবেদনের জন্য গানটি সারা ভারতে স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বাংলা কবিতা ও গানে দেশভাবনার প্লাবন নিয়ে এলেন কাজী নজরুল ইসলাম। বিশ শতকের তিনের দশক থেকে তাঁর কাব্যের জগতে নেমে পড়া। পরাধীন দেশের যুবসমাজ যেন গোগ্রাসে গিলতে লাগল তাঁর কবিতা। 'বল বীর চির উন্নত মম শির' বলে তিনি হাঁক পাড়লেন। তিনি যেমন তাঁর কবিতায় সাম্যের গান গাইলেন তেমনি গাইলেন বিদ্রোহের গান। তাই তিনি বিদ্রোহী কবি। কবিতা রচনা, গান লেখা, গান গাওয়া, সুর প্রদান, পত্রিকা সম্পাদনা প্রভৃতি নানা দিকে খুব কম বয়সেই তাঁর প্রতিভার দীপ্তি দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার কবির গান ও কবিতাকে ভয় পেত। তাই কবিকে এ কাজের জন্য জেল বন্দি করতে সময় লাগেনি সরকারের। স্বাধীনতার আগে যখন দেশে বিদ্রোহের বান ডেকেছে তখন নজরুলের গান ও কবিতা দেশের যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

(লেখক অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজী সুভাষ আশ্রম মহাবিদ্যালয় সুইসা, পুরুলিয়া)

কলকাতার ফুটপাত

আজকের কলকাতা শহর ইংরেজদের তৈরি। ইংরেজরা যেখানেই গেছে সেখানেই সেই জায়গাটিকে নিজের মতো করে নিয়েছে। ইংরেজরা যখন কলকাতাকে শহর করার মনস্থ করে তখন কলকাতা ছিল জলা জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তারপর ব্যবসা বাড়তে থাকলে লোকজনের বসতিও বাড়তে থাকে। বড়ো বড়ো অট্টালিকা তৈরি হয়। ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংয়ের আমলে কলকাতা উন্নত হতে শুরু করে। তখন কলকাতার মূল রাস্তা ছিল কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ও ওয়েলিংটন স্ট্রিট। এই দুটি রাস্তার ধারে জায়গায় জায়গায় যেমন পুকুর খনন করে উদ্যান তৈরি হয়েছিল, তেমনি পথচারীদের চলার সুবিধার জন্য রাস্তার দুধারে তৈরি হয়েছিল ফুটপাত। কয়েকটি রাস্তা পাকা করে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সকাল বিকাল জল দিয়ে পরিষ্কারও করা হতো।

কিন্তু পরবর্তীকালে পথচারীদের জন্য তৈরি ফুটপাত কেবল পথচারীদের জন্য থাকেনি। ইংরেজদের সাধের ফুটপাত এখন জবরদখলকারী মানুষের দখলে। বেআইনি দোকানের দাপটে ফুটপাত দিয়ে হাঁটাই দায় হয়ে যায় পথচারীদের।

কলকাতার ফুটপাত প্রথম মানুষের দখলে যায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়। দু'মুঠো খাবারের আশায় গ্রামের মানুষ দলে দলে আসতে থাকে কলকাতায়। কিন্তু থাকবে কোথায়? তারা আশ্রয় নেয় ফুটপাতে। ভিক্ষে করে , চেয়েচিন্তে একটু খাবার জোগার করাই তখন ছিল খুব কঠিন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষরা রাস্তাতেই মলমূত্র ত্যাগ করত। ফুটপাত হয়ে ওঠে পুতিগন্ধময়। এর কয়েক বছর পরই ১৯৪৬ সালে সংঘটিত হয় কলকাতা ও নোয়াখালিতে নৃশংস নরহত্যা এবং দেশ বিভাজন। পূর্ব-বাংলা থেকে অত্যাচারিত হয়ে দলে দলে হিন্দু আসতে থাকে পশ্চিমবাংলায়। শহর কলকাতার ওপর হঠাৎই জনসংখ্যার চাপ বেড়ে যায়। উত্তর কলকাতায় ফুটপাত আগে থেকেই ছিল, দক্ষিণ কলকাতাতে সবে ফুটপাত তৈরি হয়েছে। মানুষ বাধ্য হয়েই সংসার গুছিয়ে বসে ফুটপাতের ওপর। তৈরি হয় ছোটো ছোটো ঝুপড়ি। তখন থেকে গরিমা হারাতে থাকে কলকাতার ফুটপাত। পথচারীর চলার চেয়ে মানুষের বসবাসের জন্য বেশি ব্যবহার হতে থাকে ফুটপাত। একদিকে ঝড়বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ত্রিপল খাটিয়ে বসবাসকারী মানুষ, অন্যদিকে বাকি জায়গা দখল করে নিয়েছে অবৈধ দোকানদাররা। সরকারও পারছে না তাদের তুলে দিতে। কারণ সেটা নাকি হবে অমানবিক কাজ।

তাই কলকাতার ফুটপাত এখন আর পথচারীদের নেই। সল্টলেক উপনগরীর রাস্তার ফুটপাত কিছুদিন আগেও শুধু পথচারীদের জন্যই ছিল, তাও এখন কোনও কোনও জায়গায় দোকানদাররা বসতে শুরু করেছে। কলকাতার রাস্তা ও ফুটপাত আগের মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও নেই। আগে জল দিয়ে রাস্তা ধোওয়া হতো। এখন ধোয়ার রীতি নেই। ফলে রাস্তা ও ফুটপাত দু-ই নোংরা। শিল্পীর ক্যানভাসে, তুলির টানে আমরা দেখি পুরনো কলকাতার ছবি। চওড়া রাস্তা, চওড়া ফুটপাত, তাতে গ্যাসবাতি জ্বলছে, টানা রিকশা চলছে, ট্রাম চলছে। এখন বাস্তব চিত্র একেবরে উলটো। পরিষ্কার রাস্তা, জবরদখল মুক্ত ফুটপাতের জন্য আন্দোলন হচ্ছে। আমরা আশায় আছি, কবে ফিরবে সেই পুরনো কলকাতার পুরনো ফুটপাত, যা কেবল পথচারীদের জন্য।

অজিত ভদ্র

ভারতের পথে পথে

কোণারক

ওড়িশার কোণারক তার সূর্যমন্দিরের জন্য বিশ্ববন্দিত। সমুদ্রসৈকতে দীর্ঘকাল হারিয়ে গিয়েছিল কোণারক। ১৯০৪ সালে ৩০০শো বছরের বালি সরিয়ে নতুন করে লোকচক্ষুর সামনে আসে। কথিত আছে, পাঁচহাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে কোণারকে এসে সূর্যের আরাধনা করেন। ১২ বছরের আরাধনায় সূর্যদেব তুষ্ট হয়ে শাম্বকে রোগমুক্ত করেন। আরোগ্য লাভের পর শাম্ব মন্দির গড়ে সূর্যদেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। স্মারকরূপে মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে মেলা বসে তিন কিলোমিটার দূরে চন্দ্রভাগা ও বঙ্গোপসাগর সঙ্গমে। পুরো মন্দির ঘোড়ায় টানা রথের আদলে তৈরি। সারা পৃথিবীর পর্যটকদের জন্য সূর্যমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত।

জানো কি?

- সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু প্লাটিনাম।
- সবচেয়ে শক্ত ধাতু হীরক।
- সবচেয়ে ভারী তরল পদার্থ পারদ ও সিজিয়াম।
- সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ধাতু লোহা।
- প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় অ্যালুমিনিয়াম।
- সবচেয়ে দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত ধাতু দস্তা বা জিংক।
- জলে ভাসে সোডিয়াম ও পটাশিয়াম।
- সবচেয়ে হালকা ধাতু লিথিয়াম।

ভালো কথা

গোখরো সাপ

সেদিন বিমানদাদের বাড়িতে হুলুস্থুলু কাণ্ড। সবাই ওদের বাড়ির দিকে দৌড়চ্ছে। দাদার সঙ্গে আমিও দৌড়ে গেলাম। বিমানদার দিদি শুধু বলছে ওই ঘরে, ওই ঘরে। কেউ আর ভয়ে ঘরে ঢুকছে না। কিছুক্ষণ পরে ওপাড়ার কালিদাদু এসেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বিরাট একটা গোখরো সাপ দু'হাতে ধরে নিয়ে বাইরে এল। সবাই ভয়ে তখন জড়োসড়ো। বিমানদার ঠাকুমা কালিদাদুকে বললো-- বাইরে জঙ্গলে ওটাকে ছেড়ে দাও। কালিদাদু ছেড়ে দিতেই ঠাকুমা বললো, যা যা। সাপটি কোনও ফোঁস ফোঁস না করেই জঙ্গলের দিকে চলে গেল। তারপর ঠাকুমা সবাইকে বললো— সাপ উপকারী প্রাণী, মারতে নেই।

সুমন মাজী, নবমশ্রেণী, লালপুর, বাঁকুড়া।

বিঃ দ্রঃ- গত সংখ্যায় মুদ্রণ প্রমাদে ভালোকথার শিরোনাম 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' হয়েছে। হবে 'পরিবেশ ভাবনা'।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

আমরা

সাত্ত্বিকা ভট্টাচার্য, রাজাপুর, হাওড়া, চতুর্থ শ্রেণী

আমরা তিন ভাই-বোন
থাকি রাজাপুরে
দিদিভাই মৌমিতা, দাদা সৈকত
একই পরিবারে।
আরও আছে দুই পিসি
ছোটোমা ও কাকুন

আমি বাবা মা মিলে আমরা
মোট ন'জন।
ন'জনেতেই নইকো আমরা
কোনও মতেই খুশি
আমাদের সঙ্গেই সুখে থাকে
ভুলু আর পুষি।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ১৩

শিল্প এবং ইতিহাসের বর্ণিল মেলবন্ধন

অনন্যা চক্রবর্তী

ইতিহাসের পুনঃসৃজন সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে সিনেমায়। মাত্র আড়াই ঘণ্টার অবকাশে ঐতিহাসিক উপাদান এবং মিথের টানাপড়েনে বাণিজ্যলক্ষ্মীর করুণার আশায় শেষপর্যন্ত ইতিহাসের ঘাড়েই কোপ পড়ে। আমাদের সৌভাগ্য, জন অ্যাব্রাহাম অভিনীত পরমাণু ছবিতে তা হয়নি। ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে পরিচালক যেভাবে নাটক গড়ে তুলেছেন তাতে তাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

ছবির পুরো নাম, 'পরমাণু : দ্য স্টোরি অব পোখরান'। ছবির কাহিনি কেমন সেটা তার নামেই স্পষ্ট। তবুও গল্পটা সংক্ষেপে বলা দরকার। আসওয়াথ রায়না একজন আইএএস অফিসার। তিনি সরকারকে প্রস্তাব দিলেন, পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশ হয়ে ওঠার দৌড়ে চীন এবং পাকিস্তানের থেকে এগিয়ে থাকতে হলে ভারতের উচিত পারমাণবিক বোমা বানিয়ে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো। আমেরিকার চাপে প্রাথমিক পর্যায়ে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যর্থ হলো। রায়না দ্বিতীয় সুযোগ পেলেন ১৯৯৮ সালে। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। তার পর কী হলো জানার জন্য ছবিটা দেখতে হবে।

মাত্র কুড়ি বছর আগের ঘটনাকে ইতিহাস বললে অনেকেই হয়তো আপত্তি করবেন কিন্তু যে-ঘটনা প্রথম ভারতকে বিশ্বের পারমাণবিক মানচিত্রে গৌরবোজ্জ্বল আসন পেতে সাহায্য করেছিল, জাতীয় আবেগের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সেটি ইতিহাস অভিধায় অভিহিত হবার যোগ্য। একথা অনস্বীকার্য সিনেমার খাতিরে পরিচালক কোথাও কোথাও একটু সরলীকরণের আশ্রয় নিয়েছেন। বিশেষ করে যেভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর মার্কিন মনিটরিং সিস্টেমকে প্রায় খেলার ছলে অকেজো করে দিল সেটি আরেকটু বাস্তবধর্মী হলে ভালো হতো। কিন্তু 'পরমাণু : দ্য স্টোরি অব পোখরান' যেহেতু ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ নয়, পুনঃসৃজন, তাই শেষপর্যন্ত ছবিটি দর্শকদের কাছে বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

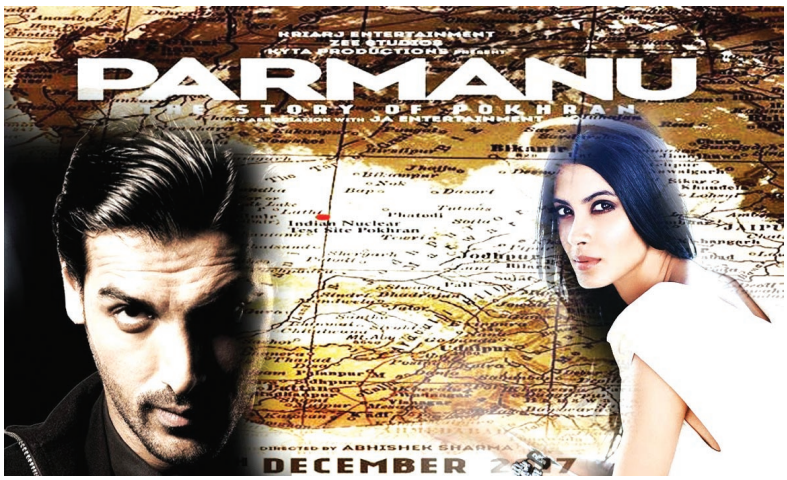

অসাধারণ চিত্রনাট্য এবং সম্পাদনা ছবিটিকে আগাগোড়া টানটান করে রেখেছে। অভিনয়ে অনুজা সাঠে (জন আব্রাহামের স্ত্রী) এবং বোমান ইরানি (প্রধানমন্ত্রীর সচিব) অনবদ্য কিছু নাটকীয় মুহূর্ত আমাদের উপহার দিয়েছেন। কমিক দৃশ্যেও তারা সাবলীল। ছবি জুড়ে রয়েছে মোটিফের ব্যবহার। কখনও ঘড়ির টিকটিক শব্দে, কখনও নজরদার উপগ্রহের রক্তচক্ষুতে কাহিনির উত্তেজনা আগাগোড়া বজায় ছিল। ভারত, পাকিস্তান এবং আমেরিকার সেই সময়কার নেতাদের রিয়েল লাইফ ফুটেজের ব্যবহার রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে।

দ্বিতীয়ার্ধের তুলনায় ছবির প্রথমার্ধ সামান্য মন্থর। ডিটেলের প্রতি পরিচালকের মাত্রাতিরিক্ত নজর এর কারণ হতে পারে। তবে পরিচালককে ধন্যবাদ, চিত্রনাট্যে একজন আই এস আই এজেন্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি তাকে বলিউডি ভিলেন বানাননি। ইতিহাস তাকে যেটুকু পরিসর দেয় তার মধ্যে থেকেই তিনি পাকিস্তানি গুপ্তচরের মুখোশ খুলে তার প্রকৃত মুখটি দেখিয়ে দিয়েছেন। ছবির শুরু থেকেই জন আব্রাহামের অভিনয় অসাধারণ। বলা যেতে পারে তিনি প্রকৃত অধিনায়কের মতো ছবিটিকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছেন। ডায়ানা পেনটিও যথাযথ। সব মিলিয়ে 'পরমাণু : দ্য স্টোরি অব পোখরান' কাহিনি এবং রাজনৈতিক কুশীলবদের প্রেক্ষিতে বিগত সময়ের ছবি হলেও উপস্থাপনার গুণে হয়ে উঠেছে এই সময়ের ছবি। যাদের জন্ম একবিংশ শতাব্দীতে তারাও এই ছবি দেখে আপ্লুত হবেন। এমনকী রাজনৈতিক প্রজনন সূত্রে যারা জাতীয়তাবাদী নন— কমিউনিস্ট, সেকুলার অথবা আঞ্চলিক, তারাও তরজা ভুলে দেশের গৌরবগাথায় গলা মেলাতে পারবেন। ■

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২৯

Regd. NGO NITI AAYOG, Govt. of India, New Delhi • Govt. Regd. W.B.

ফোন ঃ 9830597884, 9073402682, (033) 2463-7213

প্রতিষ্ঠাতা ঃ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

৩৯তম বর্ষের কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স ইন্ অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এণ্ড রাজযোগ

পাঠ্যসূচী ঃ ইনট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ,অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুড এণ্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইণ্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজের (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারওপ্যাথি,রাজযোগ ও কুণ্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাক্টিস, [স্ট্রেস(Stress) ম্যানেজমেন্ট], যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাঝ্ (যৌগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক জিম (পাওয়ার যোগা), যৌগিক চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল ঃ ১ বৎসর, প্রতি রবিবার ১ টা থেকে ৪ টে পর্যন্ত

যোগ্যতা ঃ ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ

আরম্ভ ঃ ২৪শে জুন ২০১৮

কোর্স ফি ঃ ৮০০০ টাকা, এককালীন ৬০০০ টাকা, ফর্ম ও প্রস্পেক্টাস ১০০ টাকা, ডাকযোগ ১২০ টাকা

ভর্তি চলছে

সংবাদপত্রের দায়বদ্ধতা

গৌতম কুমার মণ্ডল

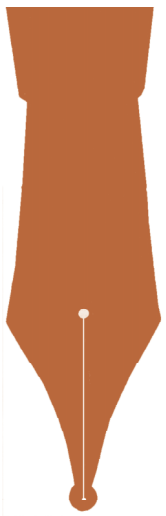

বেশ কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে দৈনিক সংবাদপত্রগুলি, বিশেষ করে বাংলা সংবাদপত্রগুলি তাদের দায়বদ্ধতার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। প্রায় সকলেই শাসকদলের কাছে তাঁদের টিকি বন্ধক রেখেছেন। ফলে অনেকেই শাসকদলের ক্যাডারের ন্যায় আচরণ করছেন। আমরা যারা সাধারণ পাঠক তারা বিভ্রান্ত হচ্ছি প্রতি মুহূর্তে। কিছু সংবাদপত্র আছে যাঁরা তাঁদের অধিকারের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেন বিচারকের ভূমিকা নিতে চাইছে। তাঁরা যা ভাবছেন সেটাই যে একেবারে সঠিক সেটাই আমাদের বোঝাতে চাইছেন। আমাদের দেশ সংবাদপত্রকে যে বিরাট অধিকার ও ক্ষমতা দিয়েছে সেকথা ভুলে তাঁরা শেষপর্যন্ত গণতন্ত্রেরই ক্ষতি করছেন।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করব। 'ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিক'-পত্রিকা গত ১৯ মে, ২০১৮ একটি সম্পাদকীয় লিখেছে— 'বিজয়ীর দায়িত্ব'। পঞ্চায়েত নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এই সম্পাদকীয়। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভের বিশেষ গুরুত্ব থাকে। সম্পাদক বা পত্রিকাগোষ্ঠী যা চান, তাঁদের একান্ত মনের কথা কী তা সম্পাদকীয় বলে দেয়। 'বিজয়ীর দায়িত্ব' শীর্ষক উক্ত সম্পাদকীয়তে ওই পত্রিকা লিখল— ''স্পষ্টতই এই নির্বাচনে বৃহত্তম বিরোধী শক্তি হিসাবে যে দলটির উত্থান হইয়াছে, তাহা পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যের পক্ষে ইতিবাচক নহে।'' বলাই বাহুল্য এই বৃহত্তম দলটি বিজেপি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিজেপি ইতিবাচক নয় কেন, পত্রিকা তা স্পষ্ট করেনি।

বিজেপি তো আজ পর্যন্ত এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসেনি। যদিও এই দলটি প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে যে মহাপুরুষের দূরদর্শিতা ইতিহাসে স্থান পেয়েছে তিনি এ রাজ্যেরই মানুষ— শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। স্বাধীনতার পর থেকে এ রাজ্য শাসন করেছে কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট, বামফ্রন্ট এবং বর্তমানে কংগ্রেস থেকে জন্ম নেওয়া তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য কি ভালো আছে? শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, শিল্পায়নে, আর্থিক ক্ষেত্রে, উন্নত মানবসম্পদে এ রাজ্য কি খুব উন্নত? পরিসংখ্যান সহজলভ্য। তা ঘাঁটাঘাঁটি করলেই এ রাজ্যের স্বাস্থ্যহীনতার কথা বোঝা যায়। যে বাংলা স্বাধীনতার আগে সারা দেশকে পথ দেখাত— জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শিল্পক্ষেত্রে— বাংলার যে সুদিন বহুপূর্বে চলে গেছে। আজ এ রাজ্যের রুগ্নমানুষ দলে দলে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে পাড়ি দেন চিকিৎসার জন্য। আর এ রাজ্যের এমন কোনও গ্রাম আছে কিনা সন্দেহ, যে গ্রামের পাঁচ-দশজন যুবক ভিন্‌রাজ্যে না গিয়েছে কাজ করতে। কী কাজ করে তারা? মূলত শ্রমিকের। ফলে আজকের বাংলা গোটা ভারতে যেন লেবার সাপ্লাইয়ার। এখানে যুব সমাজের কাজ নেই। শিক্ষিত যুবকদের চাকরি নেই, তারা ক্রমশ হতাশার অন্ধকারে হারিয়ে অন্য রাজ্যের থেকে বহু কম বেতনে কাজ করছেন। এই কম বেতন সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে কাজ সম্পর্কে একটা উদাসীনতা আর অবহেলা এনে দিয়েছে। একদিনের কাজ তাঁরা তিনদিনে করছেন। সরকারি অফিসে চালু হয়েছে ঘুষের কারবার। এতে পারতপক্ষে ক্ষতি হচ্ছে সাধারণ মানুষের। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যটা তাহলে কোথায়?

স্বাস্থ্য বলতে কি তাহলে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, সবুজসাথী, সবুজশ্রী, ক্লাবকে অনুদান আর বছরভর হরেক রকমের সরকারি মেলা খেলা মোচ্ছব? নাকি স্বাস্থ্য বলতে বোঝানো হচ্ছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে সরকারি অর্থের অবাধ লুঠতরাজ চালিয়ে যাওয়া আর তার কিছু ভাগ পার্টির সঙ্গে যুক্ত যুববাহিনীর কাছে পৌঁছে যাওয়া? নাকি স্বাস্থ্য মানে বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত— যেখানে সবটাই সবুজ, অন্য কোনও রং থাকা চলবে না। আর বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েতের লক্ষ্যে মনোনয়ন থেকে গণনার দিন পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে, গুণ্ডাবাহিনী নামিয়ে বিরোধীদের সমস্ত পরিসরকে বন্ধ করে দেওয়া। এসব কিছুকেই যদি এই পত্রিকাগোষ্ঠী স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে মনে করে তাহলে আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য অবশ্যই ভারত সেরা।

স্বাধীন সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। সংবাদপত্র সরকারের সমালোচনা করবে। তার কর্মপদ্ধতির ভুল ধরিয়ে দেবে। এতে সরকার যেমন সঠিকপথে চলতে বাধ্য হয়, তেমনি সাধারণের প্রতি দায়বদ্ধতাকে ক্ষণিকের জন্যও সরকারকে ভুলতে দেয় না সংবাদপত্র। কিন্তু সংবাদপত্র যদি তার নিজের ভালো লাগা মন্দ লাগাকে সরকার বা বিরোধী দলের উপর চাপিয়ে দিতে চায় তাহলে তা মেনে নেওয়া যায় না। সংবাদপত্রকে মনে রাখতে হবে, সে বিচারক নয়। সংবাদপত্র যে কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করতে পারে; কিন্তু গণতান্ত্রিকভাবে জিতে আসা বা বিরোধীদলের মর্যাদায় উঠে আসা কোনও দলকে দেশের বা রাজ্যের পক্ষে 'স্বাস্থ্যহানিকর'— বিচারকসুলভ এ জাতীয় কোনও রায়দানের অধিকার সংবাদপত্রের নেই। তাহলে যেমন গণতন্ত্রকে অমর্যাদা করা হয়, তেমনি যে বিপুল জনগণ সেই দলকে ভোট দিলেন তাঁরাও ভুল করেছেন বলে ঘোষণা করা হয়। এ ক্ষমতা ও অধিকার সংবাদমাধ্যমের নেই।

■

ফঃ ৬

গণতন্ত্রকে হত্যা করে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা সার্থক হতে পারে না

কে. এন. মণ্ডল

পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সমাজে সময়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পরিচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অরাজনৈতিক ছিল এবং মূলত প্রবীণরাই এতে অংশগ্রহণ করতেন— শাসকের কোনও হস্তক্ষেপ ছাড়াই। এমনকী মহাত্মা গান্ধী যে গ্রামীণ স্ব-শাসন বা স্বরাজের কথা বলতেন— তাও অরাজনৈতিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে। প্রতিবেশী বাংলাদেশে কিছুদিন আগেও স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন কাউন্সিল) গঠিত হতো রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ছাড়া। ১৯৫৭ সালে বলবন্ত রাজ মেহতার নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে বিধিসম্মত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয় পিছনে থাকা এই শ্রেণীর ক্ষমতায়নের জন্য। এই সংশোধিত ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়— যাতে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হতে পারে পঞ্চায়েত। এর ফলে 'দখল' ক্ষমতা দখলের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক দলগুলির কাছে— যা মহাত্মা একেবারেই চাননি।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার এই বিবর্তনের ফলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পশ্চাৎপদ জাতিসমূহ এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন হওয়ার কথা— কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন কতটুকু? দলের কেষ্ট-বিষ্টুরা এদের বোরের ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে— উচ্ছিষ্টের ভাগ দেয় মাত্র। আর মহিলা প্রতিনিধিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাড়ির পুরুষদের হুকুমে পরিচালিত হন— তাহলে উদ্দিষ্ট শ্রেণী সেই তিমিরেই থেকে গেলেন বহুলাংশে। অতএব পঞ্চায়েতি রাজ গ্রামের মানুষের ক্ষমতায়নের পরিবর্তে ক্ষমতাশালী করেছে রাজনীতির কুশিলবদের।

এবারে আসা যাক ২০১৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রসঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর তথাকথিত প্রশাসনিক বৈঠকের নামে বিভিন্ন জেলায় নানা প্রকল্প ঘোষণা এবং উদ্বোধনের পরিসমাপ্তিতে বিরোধীদের পর্যাপ্ত প্রচারের সুযোগ না দিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে। এর পরেই শুরু হয় সন্ত্রাস। অভিযোগ— বিরোধীদের প্রার্থী হতে বাধা দান, বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্বাচনে প্রার্থীপদে না দাঁড়ানোর হুমকি, মনোনয়ন দিতে যাওয়ার পথে বাধা এবং আক্রমণ। এর পরেও যাঁরা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার হিম্মত দেখিয়েছেন তাদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে নিরঙ্কুশ জয়ের রাস্তা পরিষ্কার করেছে তৃণমূল। এমন পরিস্থিতিতে, রাজ্যের নির্বাচন কমিশনারের ডাকে সর্বদলীয় বৈঠকে বিরোধীদের দাবি কমপক্ষে ৫ দফায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত ভোট করতে হবে যাতে নির্বাচকমণ্ডলী নির্ভয়ে ভোট দিয়ে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি চয়ন করতে পারেন। তৃণমূলের আপত্তিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনে রাজি না হলেও, ৩ দফায় ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্র সিংহ এবং ভোটে নিরাপত্তার বিষয়টি রাজ্য সরকারের দায়িত্বে ছেড়ে দেন। এই ৩ দফার ভোটে বিরোধীদের তেমন আপত্তি না থাকলেও— ২০১৩-এর পঞ্চায়েত ভোটে সহিংসতার অভিজ্ঞতার আলোকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং হিংসার কারণে মনোনয়ন পেশে অপারগ ব্যক্তিদের পুনরায় সুযোগ দেওয়ার দাবিতে বিভিন্ন বিরোধী দল মহামান্য উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়। উচ্চ আদালত ভোটের নির্ঘণ্ট ফিরিয়ে নিয়ে ১ দিনে ভোট করার ফরমান জারি করে। এছাড়াও, বিরোধীদের মনোনয়নের সুযোগ দিতে বাড়তি ১ দিন ধার্য করে এবং তা প্রত্যাহারের জন্য ৩/৪ দিন সময় দেওয়া হয়। অর্থাৎ 'পথে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকার পরে'ও যদি এই বাড়তি সুযোগে কেউ প্রার্থী হন— তার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করানোর যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে এবং বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত গঠনে দলীয় নির্দেশ সফল হবে।

মহামান্য হাইকোর্টের এই রায়ের সুযোগ নিয়ে পঞ্চায়েত ভোটে অভূতপূর্ব সন্ত্রাসের আবহে ১৫/১৬টি তাজা প্রাণের রক্তস্নাত ভোটের পরেও পুলিশের ডি.জি. সুরজিত পুরকায়স্থ নির্বাচনের দিন সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, এবারের ভোট ২০১৩-এর তুলনায় শান্তিপূর্ণ হয়েছে এবং জীবনহানি কম হয়েছে। তিনি সাফাই দেন মৃতদের সকলেই ভোটের বলি হননি, অন্য কারণও আছে। অর্থাৎ কোর্ট নির্দেশিত ক্ষতিপূরণের আওতার বাইরে ওঁরা। একজন পুলিশ অফিসারের এ ধরনের বক্তব্যে রাজ্যবাসী স্তম্ভিত এবং ব্যথিত এই কারণে যে, এত হিংসা এবং প্রাণহানির পরেও এই নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ বলা যায়— আর কত মৃত্যু হলে নির্বাচনকে রক্তক্ষয়ী বলা যাবে মিঃ পুরকায়স্থ? আপনার দায়িত্ব ছিল নির্বাচনে যাতে একটিও প্রাণ না যায় তা নিশ্চত করা, কেননা কেন্দ্রীয় বাহিনী না এনে নির্বাচনে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব আপনারাই কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

পশ্চিম বাংলায় পঞ্চায়েত ভোটে সহিংসতার ছবি বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমে দেখেছেন সমস্ত ভারতবাসী, এমনকী বিদেশিরাও। চারিদিকে ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে— আর শাসকদল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সাফল্যে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বুথে ঢুকে বিরোধী এজেন্টকে থাপ্পড় মারছেন— আবার সংবাদ মাধ্যমে বলছেন 'আপনারা ভুল দেখেছেন— ভুল শুনেছেন'। যে দলের নেতা-মন্ত্রীরা ক্যামেরাবন্দি ঘটনাই অস্বীকার করেন, তাদের দল ভোটে ব্যাপক হিংসার দায় কখনোই নেবে না।

তাহলে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কী? এভাবেই কি প্রতিকারহীনভাবে হত্যা করা হবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে? রুদ্ধশ্বাস একটা ভীতির আবহ যেন পুরা বাঙালিকে নির্বীজ, নির্লিপ্ত করে রেখেছে। ভাবখানা এমন 'আমি কী করতে পারি'— সব জঞ্জাল সাফাইয়ের দায় যেন অন্যদের। এভাবে প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলতে ফেলতে হয়তো বাঙালি জাতিটাই একদিন তার মেরুদণ্ড হারিয়ে ফেলবে। ■

জ্যৈষ্ঠমাসের চাষবাস

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

সুপারি :

জ্যৈষ্ঠমাসে প্রতিটি গাছে ১২ কেজি সবুজ সার, ১২ কেজি পাতা কম্পোস্ট বা গোবর সার; রাসায়নিক সার হিসাবে ২২০ গ্রাম ইউরিয়া,২৫০ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং ২২৫ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ সার দিতে হবে। এই সার বৈশাখমাসেও দেওয়া যায়। পঞ্চম বছর থেকে গাছে পুরো মাত্রায় সার দিতে হবে।

দ্বিতীয় বছরের গাছে পুরো মাত্রায় জৈব সার এবং এক তৃতীয়াংশ রাসায়নিক সার লাগবে। তৃতীয় ও চতুর্থ বছরের গাছে পুরো মাত্রায় জৈবসার এবং দুই-তৃতীয়াংশ রাসায়নিক সার দিতে হবে। সার দু'দফায় দিতে হবে। সেচের সুবিধা থাকলে ফাল্গুনে (মোট সারের এক তৃতীয়াংশ) এবং আশ্বিনে (বাকি অংশ) সার দিতে হবে। বৃষ্টি নির্ভর হলে প্রাক-মৌসুমির উপর নির্ভর করে বৈশাখ মাসে এবং আশ্বিনমাসে প্রয়োগ করতে হবে। ফাল্গুন বা বৈশাখে গাছের গোড়ায় ছিটিয়ে সার দিতে হবে, তারপর আগাছা দমন করে তা মাটির সঙ্গে হালকা খুঁড়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

আশ্বিন মাসে যে সার দেওয়া হবে তা গাছের চারপাশে ৭৫ সেন্টিমিটার থেকে এক মিটার ব্যাসার্ধের গোলাকার বেসিন করে তার মধ্যে দিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়। এই বেসিনের গভীরতা হবে প্রায় ২০ সেন্টিমিটার।

যারা নতুন গাছ লাগাবেন তারা স্থানীয় ভালো নাটযুক্ত সুপারি জাত অথবা 'মোহিতনগর', 'মঙ্গলা', 'সুমঙ্গলা' বা 'শ্রীমঙ্গলা' জাত লাগাতে পারেন। মোহিতনগর জাতটি উচ্চ ফলনশীল, গাছ প্রতি সাড়ে তিন থেকে চার কেজি সুপারি ফলে। ভালো নিকাশি জমিতে জ্যৈষ্ঠমাসে এবং এঁটেল মাটিতে ভাদ্র মাসে চারা লাগান। চারা লাগাতে হবে ২.৭×২.৭ মিটার দূরত্বে। ৬০×৬০×৬০ সেন্টিমিটার মাপের গর্ত খুঁড়ে তাতে এক বছর বয়স পাঁচ-ছয় পাতার ছোটো চারাগাছ বসান। চারা বসানোর আগে তাতে গোবর সার, বাগানের মাটি ও বালির মিশ্রণ ৫০ সেন্টিমিটার ভরে তারপর সোজা ভাবে গর্তে চারা লাগাতে হবে। বর্ষার আগে পর্যন্ত সেচের ব্যবস্থা রাখুন।

পেঁয়াজ :

বর্ষাকালেও পেঁয়াজ চাষ করা যাবে। জ্যৈষ্ঠমাস থেকে প্রস্তুতি নিন। লাভজনক ভাবে বর্ষাকালে পেঁয়াজ চাষ করতে পারবেন। আশ্বিন-কার্তিক মাস থেকে বাজারে পেঁয়াজের দাম চড়তে থাকে। তাই বেশি আয় করতে বর্ষাকালে চাষ শুরু করুন।

বীজতলা তৈরি করে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সময় থেকে বীজ বুনুন। আষাঢ় মাস জুড়েই বীজ বুনতে পারবেন। এক বিঘাতে পেঁয়াজ লাগাতে হলে এককাটা জমিতে বীজতলা তৈরি করতে হবে। এজন্য এক কেজি বীজ লাগবে। বীজতলার মাটি শোধন করুন। জৈবসারের সঙ্গে জীবাণু-সার ট্রাইকোডার্মা ডিরিডি মিশিয়ে বীজতলায় দিন। তামা-ঘটিত ছত্রাকনাশক দিয়েও বীজতলা শোধন করা যায়। যেন নিকাশের বন্দোবস্ত থাকে, মাটি ঝুরঝুরে থাকে, সারাদিন অফুরন্ত আলো পায়।

বীজতলায় প্রয়োগ করুন (১০×৩ ফুট মাপের উঁচু বীজতলা) ২২৫ গ্রাম ইউরিয়া ৫০০ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং ২৫০ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ। বীজতলায় দুই ইঞ্চি দূরে সারিতে বীজ ফেলুন। গভীরতা হাফ-ইঞ্চি হওয়া দরকার। বীজ বোনার পর মাটি বা জৈবসার ছড়িয়ে ঢেকে দিতে হবে। তার উপর ঢাকা পড়বে খড়ের পরত। হালকা সেচ দিতে হবে ঝারি দিয়ে। অঙ্কুর বেরোতে শুরু করলে ঢাকা সরিয়ে নিন। বর্ষা বেশি হলে বাঁশের ফ্রেম বানিয়ে পলিথিন চাপান। এক দেড় মাসের চারা মূল জমিতে লাগান।

মিজোরাম খ্রিস্টান রাজ্য, তাই হিন্দু রাজ্যপাল হটাও

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের সংবিধানের প্রতি চূড়ান্ত অশ্রদ্ধা এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে নজিরবিহীন অসহনশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করল মিজোরাম। রাজ্যের কয়েকটি খ্রিস্টান সংগঠন এবং রাজনৈতিক দল সম্প্রতি দাবি তুলেছে, মিজোরাম যেহেতু খ্রিস্টান রাজ্য তাই এখানে হিন্দু রাজ্যপাল রাখা চলবে না।

ভারতীয় জনতা পার্টির বর্ষীয়ান নেতা কুম্মানাম রাজাশেখরন মিজোরামের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর বিতর্কের সূত্রপাত। ২৯ মে রাজ্যপাল শপথগ্রহণ করেন এবং তার ঠিক পরদিনই খ্রিস্টান সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, একটি খ্রিস্টান রাজ্যে একজন হিন্দু রাজ্যপালকে তারা বরদাস্ত করবে না। মিজোরামের রাজ্যপাল হওয়ার আগে রাজাশেখরন কেরলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন স্বয়ংসেবক এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গেও যুক্ত।

কুম্মানাম রাজাশেখরন

ইউসিএনিউজ ডটকমের সূত্র অনুযায়ী, রাজাশেখরন রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেওয়ার পর খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। রাজাশেখরন সম্বন্ধে কেউ বলেছিলেন, 'আদর্শগত দিক থেকে গোঁড়া রাজনীতিক'। আবার কেউ বলেছিলেন, 'রাজ্যপাল হিসেবে তিনি অরাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে পারবেন।' কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব পালটে যায়। কোনও কোনও মহল থেকে বলা শুরু হয়, মিজোরামের রাজ্যপাল হিসেবে রাজাশেখরনের নিয়োগ আসলে বিজেপির এ রাজ্যে রাজনৈতিক ভূমি তৈরির একটা প্রয়াস। মিজোরামে নির্বাচনের আর বিশেষ দেরি নেই। সেই জন্যেই রাজাশেখরনকে পাঠানো হয়েছে। বিশপ রটলুয়াঙ্গা, যিনি রাজাশেখরনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বলেন, 'রাজ্যপালের নিয়োগ মিজোরামের নির্বাচনে কোনও প্রভাব ফেলবে কিনা, এখনই বলা সম্ভব নয়। মিজোরামের মানুষ বহুদিন ধরে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করছেন। ধর্ম ভাষা জাতি কখনও সেই সহাবস্থানের অন্তরায় হয়নি। আশা করব এরপরও হবে না।' এদিকে বিতর্কে ইন্ধন জোগাতে এগিয়ে এসেছে মিজোরামের রাজনৈতিক দলগুলিও। পিপলস রিপ্রেজেন্টেশন ফর আইডেন্টিটি অ্যান্ড স্টেটাস অব মিজোরাম (পি আর আই এস এস) এবং গ্লোবাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ান খ্রিস্টানস (জিসিআইসি) রাজাশেখরনকে বর্ণনা করেছে মৌলবাদী হিন্দু বলে। জিসিআইসি-র সভাপতি সাজন কে. জর্জ বলেন, এই নিয়োগে তিনি মর্মাহত। তাই তারা রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে অনুরোধ করবেন কোনও ভদ্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার কাউকে পাঠাতে।

একটি রাজনৈতিক দলের এমনতরো অসাংবিধানিক দাবিতে স্তম্ভিত হয়ে গেছে দেশ। প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতারা সাংবিধানিক কাজে নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ জানাতে পারেন? বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এই দাবির সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই। এর আগে ভৈক্কম পুরুত্তোমন মিজোরামের রাজ্যপাল হয়েছেন। তারপর হয়েছেন নির্ভয় শর্মা। এঁরা সকলেই হিন্দু। বিজেপি নেতাদের মতে, সঙ্ঘের ব্যাপারে আপত্তিও ধোপে টেকে না। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি দু'জনেই স্বয়ংসেবক। তাই খ্রিস্টান নেতা ও ধর্মগুরুদের দাবিকে তারা ধর্তব্যের মধ্যে ধরতে রাজি নন।

অগ্নি-৫ সফল উৎক্ষেপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অগ্নি-৫ ব্যালেস্টিক মিসাইলের সফল উৎক্ষেপণ করল ভারত। ওড়িশার ড. আবুল কালাম দ্বীপ (পূর্বতন হুইলার দ্বীপ) থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। এর আগে পাঁচবার অগ্নি-৫এর পরীক্ষামূলক উৎক্ষপণ হয়েছে এহং প্রত্যেকবারই সফল হয়েছে প্রয়াস। সাম্প্রতিক উৎক্ষেপণে ব্যবহার করা হয়েছে মোবাইল লঞ্চার লঞ্চপ্যাড-৪। উল্লেখ্য, অগ্নি-৫এর ভার বহন ক্ষমতা ১.৫ টন। ৫০০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রমে সক্ষম অগ্নি-৫ ভারতের ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ছোঁড়া হলে এর আওতায় চলে আসবে চীনের বিস্তীর্ণ এলাকা। সফল উৎক্ষেপণের পর ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (ডি আর ডি ও) পক্ষ থেকে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

চীনের ঋণ কূটনীতি নিয়ে ভারতের উদ্বেগ, সমর্থন আমেরিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চীনের 'ঋণ কূটনীতি'র বিষয়ে ভারতের উৎকণ্ঠাকে সমর্থন করল আমেরিকা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে আর্থিক ঋণ দিয়ে তাদের ঋণজালে আবদ্ধ করার বিনিময়ে সামরিক সুবিধা আদায় করছে চীন, সম্প্রতি ভারত এই অভিযোগ তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ধরনের ঋণের বিপদ গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরে বলেছেন, এটি আসলে দক্ষিণ এশিয়ার আনুগত্য আদায়ে চীনের কৌশল। সতেরোতম এশিয় নিরাপত্তা শিখর সম্মেলনে সিঙ্গাপুরের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজে মোদীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর এনিয়ে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব জেমস মাটিস। মাটিসের বক্তব্য, এই সম্মেলনে মোদী যেভাবে চীনের ঋণ-কূটনীতিকে তুলে ধরেছেন এবং তার বিপজ্জনক দিকটিকে আনুগত্য আদায়ের কৌশল বলে চিহ্নিত করেছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রসঙ্গত, বার্ষিক এশিয় নিরাপত্তা শিখর সম্মেলনের মুখ্য ভাষণে মোদী বলেন যে 'শ্রীলঙ্কা, তাইল্যান্ড, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশগুলিকে আর্থিক ঋণ দিয়ে তাদের কাছ থেকে 'কৃতজ্ঞতা'র নামে অন্যায্য সুবিধে আদায় করতে চাইছে চীন। মোদীর বক্তব্য ছিল এই ক্ষুদ্র ও আর্থিক সঙ্গতিহীন দেশগুলির পক্ষে আগামীদিনে চীনের বিপুল আর্থিক ঋণ বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং এই দেশগুলির সেই ঋণ পরিশোধ করবার অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে চীন তাদের কাছ থেকে সামরিক সুবিধা আদায় করতে চাইবে। তিনি উদাহরণ হিসেবে বহুবিতর্কিত দক্ষিণ চীন সাগর ও তার বলয় ঘিরে চীনের অনৈতিক কার্যকলাপ এবং এখানে রাস্তার পরিকাঠামো বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে চীনের আর্থিক ঋণ দেওয়ায় প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াও চীনের ঋণ-কূটনীতি নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে অভিযোগ জানিয়েছে। তবে সম্প্রতি এনিয়ে ভারতের সরব হওয়া ও আমেরিকার সমর্থন গোটা বিশ্বকেই চিন্তিত করেছে। জেমস মাটিসের কঠোর মন্তব্যে চীন উষ্মা প্রকাশ করলেও বিশ্বের দরবারে তাদের ন্যূনতম সহানুভূতিও জোটেনি। বিশেষ করে মোদী চীনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সম্মেলনে বলেছেন : 'চীন তার প্রতিবেশী ও অন্যান্য দেশকে আরও আর্থিক ক্ষমতাশালী করুক, কিন্তু তাদের ঋণজালে আবদ্ধ করে নয়; তারা অবশ্যই বাণিজ্যকে আরও উন্নততর করে তুলে ধরুক, কিন্তু কৌশলগত প্রতিযোগিতায় গিয়ে নয়। এই নীতি অনুসরণ করলে আমরা প্রত্যেকের সঙ্গে ও পরস্পরের জন্য কাজ করতে পারবো।'

কূটনীতিজ্ঞরা মনে করেন চীন মোদীর সদুপদেশ বিশেষ মানবে না। তবে চোর ধর্মের কথা না শুনলেও মোদীর বক্তব্য বিশ্ববাসীর কাছে সাদরেই গৃহীত হয়েছে। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে মার্কিন মুখপাত্র ক্যাপেন জেফ ডেভিস বলেছেন— ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব বাড়াতে ও বিশ্বে শান্তি, স্থিতাবস্থা ও সমৃদ্ধি বজায় রাখতে তাঁদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মার্কিন নিরাপত্তা- সচিবের ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া তারই কিছুটা প্রতিফলন বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের একাংশের ধারণা।

রোহিঙ্গা সম্পর্কে কঠোর কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বেআইনি রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা যেসব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে তার বাইরে কোথাও যেন যেতে না পারে— সে ব্যাপারে কড়া অবস্থান নিয়ে জম্মু-কাশ্মীর সরকারকে নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। জম্মু-কাশ্মীর ছাড়াও আরও যে কয়টি রাজ্য থেকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের খবর এসেছে— সেই সব রাজ্যগুলিকেও একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীর সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং তাদের বায়োমেট্রিক পরীক্ষা করাতে হবে। এদের কাউকেই আধার কার্ড অথবা কোনো সরকারি পরিচয়পত্র দেওয়া যাবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সূত্রটি জানিয়েছে, রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে মায়ানমার সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে সুবিধা হবে বলেই এদের সব ব্যক্তিগত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এই পদক্ষেপে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে। তা হলো, রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব যথেষ্ট কঠোর। রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের যে ভারত সরকার কোনও মতেই আর এদেশে থাকতে দিতে চায় না— স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এই নির্দেশিকা তারই প্রমাণ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্র বলছেন, রোহিঙ্গা মুসলমানরা যে দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক— তা কেন্দ্রীয় সরকারও স্বীকার করে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। এদের ভিতর জম্মুতে ৭০৯৬, হায়দরাবাদে ৩০৫৯, মেওয়াতে ১১১৪, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে ১২০০, দিল্লিতে ১০৬১ এবং জয়পুরে ৪০০ জন অবৈধ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্র আরও জানাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের কিছু দালাল এই অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের ভুয়ো সরকারি পরিচয়পত্র করিয়ে দিচ্ছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের জন্য শিবির চালাচ্ছে বলেও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছে খবর আছে।

LL.B (3 years) ভর্তির জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন।

যোগ্যতা : যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি / মাস্টার ডিগ্রি।

নম্বর সাধারণ	:	৪৫%
O.B.C.	:	42%
S.C. / S.T.	:	40%

এবছর বয়সের ঊর্দ্ধসীমা নেই।

চলভাষ : 9830854761

মেঘালয়ে বিজেপি জোট সরকারকে হেনস্থা করতে গণ্ডগোলের চক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মেঘালয়ে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি এবং বিজেপি জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা অভিযোগ করেছেন, ওই রাজ্যে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গোষ্ঠী সংঘর্ষে উস্কানি দিচ্ছে এক বহিরাগত শক্তি। গোষ্ঠী সংঘর্ষ ছড়াতে প্রচুর অর্থ এবং মদ বিলি করা হচ্ছে শিলংয়ের এক শ্রেণীর যুবকদের ভিতর। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ঘটনায় ষড়যন্ত্রেরই আভাস পাচ্ছে মেঘালয়ের বিজেপি জোট সরকার। মেঘালয়ের রাজধানী শিলংয়ে এই গণ্ডগোলের শুরু গত ৩১ মে থেকে। শিলংয়ের থেমলিউ মাওলং এলাকার পঞ্জাবি বসতিতে এক শিখ রমণী এবং এক খাসি যুবকের ভিতর তর্কাতর্কি থেকে এই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। এই পঞ্জাবি বসতিতে প্রায় সাড়ে তিনশো শিখ পরিবার বসবাস করে।

এই তর্কাতর্কিকে কেন্দ্র করে শিলংয়ের এক শ্রেণীর মানুষ নানাবিধ গুজব ছড়িয়ে দেয়। গুজবের ফলে পঞ্জাবি বসতি এলাকায় গোষ্ঠী সংঘর্ষ দেখা যায়। পঞ্জাবি বসতির শিখ পরিবারগুলিকে দ্রুত নিরাপত্তা দেওয়া হয়। পরিস্থিতি সামলাতে সেনা নামানো হয়। কার্ফুও জারি হয়। তবে, এরই মধ্যে এক শ্রেণীর উন্মত্ত জনতা শহরে ভাঙচুর চালায় এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায়। পর্যটনের মরশুমে এই গণ্ডগোলে আতঙ্কিত পর্যটকরা শিলং ছেড়ে দ্রুত গুয়াহাটি বা অন্যত্র চলে যান। ফলে পর্যটন ব্যবসারও ব্যাপক ক্ষতি হয়।

মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা এই গণ্ডগোলের পিছনে ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়েছেন। সাংমা রবিবার বলেছেন, 'শিলংয়ের একটি নির্দিষ্ট এলাকাতেই এই গণ্ডগোল সীমাবদ্ধ ছিল। তাকে ছড়িয়ে পড়তে দেওয়া হয়নি। তবে, এই গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে যে কিছু লোক দেদার টাকা এবং মদের বোতল ছড়াচ্ছিল সেই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।' সাংমা বলেছেন, 'এই গণ্ডগোলের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে যাদের ধরা হয়েছে, তারাই স্বীকার করেছে একটি বিশেষ মহল টাকা এবং মদের লোভ দেখিয়ে তাদের এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে নামিয়েছিল। এই বিষয়টি নিয়ে এখন তদন্ত চলছে। কোথা থেকে এই টাকা এসেছিল— তার তদন্ত চলছে।'

সাংমা অভিযোগ করেছেন, তদন্ত করে দেখা গিয়েছে, যারা গণ্ডগোলের ঘটনায় জড়িত, তাদের গরিষ্ঠ অংশই মেঘালয়ের বাইরে থেকে এসেছে। পূর্ব খাসি হিলস জেলার ডেপুটি কমিশনার পিএম খার বলেছেন, ঘটনার তিনদিন পরে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৩টা অবধি কার্ফু শিথিল করা হয়েছিল। তাতে দেখা গিয়েছে, স্থানীয় মানুষ শান্তি-শৃঙ্খলার পক্ষে। তারা চার্চে গিয়ে প্রার্থনা সেরেছেন। দোকান- বাজার করেছেন। কোথাও কোনো অশান্তি হয়নি।

এদিকে, এই ঘটনার পর পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিংহ ঘোষণা করেন, শিলংয়ে বসবাসকারী শিখদের অবস্থা খতিয়ে দেখতে পঞ্জাব সরকারের মন্ত্রী সুখজিন্দর রণধাওয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হচ্ছে। এরই মধ্যে দিল্লি শিখ গুরুদ্বার কমিটির একটি প্রতিনিধি দল শিলংয়ে এসে সেখানকার শিখ বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। পরে তাঁরা সাংবাদিকদের বলেন, 'মেঘালয়ে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষরা নিরাপদেই আছেন। তাদের ওপর কোনও হামলা হয়নি। খাসি সম্প্রদায়ের সঙ্গেও তাদের কোনও বিরোধ নেই। শিলংয়ে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষরা তাদের বসতি থেকে উচ্ছেদ হননি।' মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমাও বলেছেন, 'এই ঘটনাকে কেউ যেন কোনও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের রূপ দেওয়ার চেষ্টা না করেন।'

তবে, শিলংয়ের এই ঘটনার পিছনে এক গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রেরই ইঙ্গিত পাচ্ছেন বিভিন্ন মহল। গত কয়েকবছরে উত্তর- পূর্বের রাজ্যগুলিতে বিজেপির প্রভাব বেড়েছে। আঞ্চলিক দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে বিজেপি সরকারও গড়েছে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে উত্তর-পূর্বে বিজেপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতেই বহিরাগতদের সাহায্য নিয়ে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক উস্কানি ছড়ানো হচ্ছে বলেই সন্দেহ রাজনৈতিক মহলের।

পঞ্জিকা বা পাঁজি হিন্দু জীবনচর্যার এক অপরিহার্য গ্রন্থ

স্বপন দাশগুপ্ত

কখনো কখনো একটি মাত্র শব্দ অনেক পৃথক, বিভিন্ন বা অসদৃশ বিষয় পরিবেশন করে,—পঞ্জিকা সেরকমই একটি শব্দ।

পঞ্জিকা হিন্দু গ্রহবিজ্ঞান বিষয়ক বর্ষপঞ্জী যা ওড়িশি, মৈথিলি, অসমীয়া এবং বাংলায় প্রকাশিত হয়। কথ্য ভাষায় পঞ্জিকাকে পাঁজি বলা হয়। ভারতবর্ষের অন্য বহুস্থানে পঞ্জিকা 'পঞ্চাঙ্গ' নামে পরিচিত। ভারতে প্রকাশিত বার্ষিক পুস্তিকার মধ্যে এটি একটি অতি জনপ্রিয় পুস্তক। লৌকিক প্রয়োজনে ধর্মকৃত্য সম্পাদনের সহায়ক দিন তারিখযুক্ত বর্ষপঞ্জী। পঞ্চাঙ্গ থেকে পঞ্জিকা নামটির উৎপত্তি। অতি সহজে পাঁজির সাহায্যে আমরা আচার, অনুষ্ঠান, বিবাহ, বিদেশযাত্রা ইত্যাদি নানা বিষয়ের শুভ মুহূর্ত সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা করতে পারি। বিস্তারিত ভাবে পুরোহিত বা জ্যোতিষীর কাছে কোনও বিষয় জানবার আগে পাঁজি আমাদের এক প্রাথমিক সূত্র। কার্যকরী এবং ব্যবহারিক খবর প্রকাশ করার জন্য অবিশ্বাসী হিন্দু এমনকী অহিন্দুরাও পাঁজির শরণাপন্ন হয়। পঞ্জিকায় প্রতিদিনের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়, চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্তের সময়, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা তথ্য থাকে। হিন্দু ছাড়াও মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মকৃত্যের দিন ও তার অনুষ্ঠানের সময়, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি শুভ কাজের দিনক্ষণ, নানাবিধ লৌকিক কাজের শুভ ও অশুভ সময়েরও উল্লেখ থাকে। তাছাড়া রাশিফল, লগ্নফল, রাষ্ট্রগত বর্ষফল প্রভৃতিও পঞ্জিকার অন্তর্ভুক্ত। তিথি নক্ষত্রের সময় এবং সারা বছরের পূজাপার্বণের ও নানাবিধ সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের দিন ও তার অনুষ্ঠানের সময়ের উল্লেখ থাকার জন্য ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে পাঁজি একটি অপরিহার্য গ্রন্থ।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পঞ্জিকার বিভিন্নতার জন্য আমাদের দেশে এক জটিল পঞ্জিকা বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলায় দু'ধরনের পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়।

(১) দৃকসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা বা শুদ্ধপঞ্জিকা।

(২) অদৃকসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা বা অশুদ্ধপঞ্জিকা।

দৃকসিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রের দৈনন্দিন অবস্থান জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিকতম পদ্ধতিতে নির্ভুলভাবে গণনা করা হয়। অদৃকসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণনা প্রাচীনপন্থী 'সূর্যসিদ্ধান্ত' গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল যা আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টাব্দে রচিত। যে সময়ে সূর্যসিদ্ধান্ত রচিত হয়েছিল তখন ওই গ্রন্থের সূত্রাবলীর সাহায্যে গ্রহের অবস্থান গণনা করলে তা অনেকাংশে নির্ভুল হতো কিন্তু বর্তমানে ওই সূত্রাবলীর সাহায্যে দেওয়া তিথির সময়ে পার্থক্য ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ২০০৫ সালের দুর্গাপূজার দিন দু'রকম পঞ্জিকা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেছিল। কোনও কোনও পূজা কমিটি 'গুপ্তপ্রেস' পঞ্জিকার জনপ্রিয়তার জন্য তাদের দেওয়া তারিখই অনুসরণ করেছিল। প্রাচীন প্রথাকে সম্মান জানিয়েও প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত নিতাই চক্রবর্তী (যিনি বৈদিক পণ্ডিত এবং পুরোহিত মহামিলন কেন্দ্রের সভাপতি) গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাকেই সমর্থন করেছিলেন। বেলুড়মঠের সভাপতি থাকাকালীন স্বামী বিবেকানন্দ অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত বিবেচনায় 'বিশুদ্ধ' পঞ্জিকাকেই সমর্থন করতেন। তাই ২০০৫ সালে বেলুড়মঠ বিতর্কিত তারিখের মধ্যে ওই পঞ্জিকার মতকেই সমর্থন জানিয়েছিল।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা ২০০৭ সালে বিভিন্ন নতুন বৈশিষ্ট্যসহ প্রকাশিত হলো। বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন 'দিনকে চিনুন', দৈনন্দিন জন্মপত্রিকা বা ঠিকুজি, কোষ্ঠিবিচার ইত্যাদি। কালক্রমে এতে যুক্ত হলো ভ্রমণকারীদের জন্য বিভিন্ন আকর্ষণ, তীর্থযাত্রীদের যাত্রাস্থল, টেলিফোন কোড এবং অন্যান্য সাধারণ খবরাখবর। বর্তমানে এই পঞ্জিকা লন্ডন, ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কে দুর্গাপূজার দিনক্ষণ, সেখানকার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের উপর ভিত্তি করে ছাপা হয়।

'বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত' পঞ্জিকার আবির্ভাবের কারণ বিখ্যাত পণ্ডিত এবং জ্যোতির্বিদ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তৎকালীন প্রচলিত পঞ্জিকা পাঠ করে গ্রহ ও নক্ষত্রের বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত পার্থক্য লক্ষ্য করলেন। তিনি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পঞ্জিকাকে নতুন করে ছাপালেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংশোধনকে সমর্থন জানানো হলো। তাঁদের মধ্যে ওড়িশার মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহসামন্ত এবং পুনের বালগঙ্গাধর তিলক অন্যতম।

১৯৫২ সালে ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পঞ্জিকার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো হলো। ভারত সরকার মেঘনাদ সাহাকে সভাপতি করে একটি পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটির ১৯৫৫ সালে সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে পঞ্জিকার সমস্ত তথ্যাদি গণনার সুপারিশ ভারত সরকার গ্রহণ করেন।

বিশুদ্ধ ও দিক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাকে আদর্শ হিসাবে ইংরাজি এবং আরও ১০টি ভারতীয় ভাষায় প্রতি বছর 'রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ' ইলেকট্রনিক গণনযন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। □

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

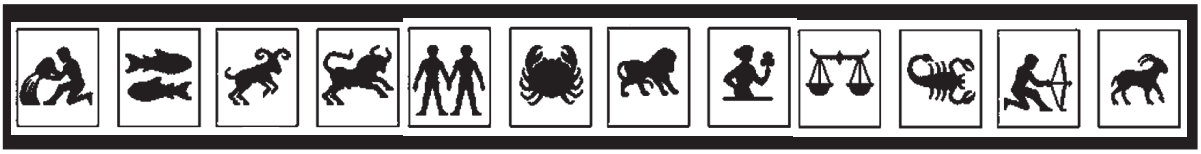

১১ জুন (সোমবার) থেকে ১৭ জুন (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে বৃষে রবি, মিথুনে বুধ, কর্কটে শুক্র-রাহু, তুলায় বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, মকরে মঙ্গল এবং কেতু। শনিবার রাত্রি ১১টায় রবির মিথুনে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মেষে ভরণী থেকে কর্কটে পুষ্যা নক্ষত্রে।

মেষ : শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বহুলাংশে সাফল্য। উৎসাহ-উদ্যম ও দৃঢ় প্রত্যয়ে কর্মজীবনে প্রবেশের প্রভূত সম্ভাবনা। নেতৃত্বের যুক্তি ও আবেগ মিশ্রিত বক্তৃতায় সদূর-প্রসারী প্রভাব। বিলাস দ্রব্য ক্রয় ও মৌলিক চিন্তা-ভাবনার বাস্তবায়ণ।

বৃষ : কথাবার্তায় সতর্ক ও লিখিত কোনও বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। একাধিক উপায়ে আয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত তবে ভাবাবেগে শত্রুর শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ইমারতি দ্রব্য, দালালি, প্রমোটারি ও খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায় শুভ। বিদ্যার্থীর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর, প্রিয়জনের কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনা। বয়স্ক মিত্রের পরামর্শ এড়িয়ে চলা শুভ।

মিথুন : ঝুলে থাকা সমস্যা, সমাজ কল্যাণমূলক কর্ম ও নতুন ব্যবসার প্রসার। আত্মীয় পরিজন-সহ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে শান্তি ও স্বস্তি। প্রভাবী, জ্ঞানী-গুণীজনের সান্নিধ্যে শিক্ষার্থীর নবোদ্যাম পথ চলা। সপ্তাহের শেষভাগে সন্তানের মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি ও সময়ের অপচয়।

কর্কট : সপ্তাহের প্রথমভাগে নিকটবর্তী কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। আত্মীয় পরিজন ও গৃহের পরিবেশ বুদ্ধিমত্তায় পরিচালনা করুন। সহোদর বা ঘনিষ্ঠজনের খেয়ালীপনায় অভিমানের পরিবর্তে সমঝোতা অনেকাংশে শ্রেয়। প্রতিষ্ঠানের প্রধান, গবেষক, বিজ্ঞানীদের শুভ কর্মে স্বাচ্ছন্দবোধ ও অগ্রগতি।

সিংহ : বিদ্যার্থী, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ব্যারিস্টার প্রফেসরের সৃষ্টিশীলতায় বৈচিত্র্য, বিত্ত ও অভিজাত্য গৌরব সপ্তাহের মধ্যভাগে দয়ার্দ্রহৃদয়ের কারণে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা, কর্মের যোগসূত্রে কুহকের জলে পড়ার সম্ভাবনা। সপ্তাহের শেষভাগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য—লক্ষ্যপূরণ। সামাজিক ক্ষেত্রে সম্মান বৃদ্ধি।

কন্যা : শরীর, মন, বুদ্ধি, উৎফুল্ল ও উদ্দীপনায় ভরপুর। জ্ঞান, বিদ্যা ও প্রশিক্ষণের নতুন দিশায় প্রতিভার স্বাক্ষর। স্বীয় উপস্থিতি ও বাক্‌চাতুর্যে প্রভাব বৃদ্ধি। বিলাস-ব্যসন, গৃহসজ্জায় পরিপাট্য লাভ, শিল্পী, কলাকুশলী, স্ত্রীরোগ, বিশেষজ্ঞ বিউটিশিয়ানদের বৈষয়িক সমৃদ্ধি, শেষভাগে স্নেহপ্রবণ মন-সুন্দরের পূজারী সৃষ্টিশীল কর্মে উৎসাহ।

তুলা : সন্তান ও যুবাদের কারণে মানসিক অস্বস্তি। কর্মক্ষেত্রে মহিলার চালাকি ও কৌশলী মানসিকতায় সময়ের অপচয়। শেষভাগে দায়িত্ব-প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। মাতৃসুখ। সৃষ্টির আনন্দযজ্ঞে মানবিকতার প্রকাশ ও মান্যতা। স্নেহভাজনের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়।

বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে দক্ষতাবৃদ্ধি ও একাধিক উপায়ে অর্থাগমের ক্ষেত্র প্রশস্ত। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের ফল ইতিহাচক। ভ্রাতা-ভগিনীর শুভ সংবাদ যা আশান্বিত ও সৌভাগ্যসূচক। পরিবার পরিজন-সহ দূর ভ্রমণ। সন্তানের চলাফেরায় নেতিবাচক পরিবর্তন। জেদই অনেকাংশে ক্ষতির কারণ। কীট-পতঙ্গ অথবা শরীরের উর্ধাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

ধনু : গণিতজ্ঞ, সার্ভেয়ার, আর্কিটেকচার, চাটার্ড অ্যাকাউন্টট্যান্ট, আইটি সেক্টরে কর্মরতদের চিন্তার স্বচ্ছতা— প্রতিভার ব্যাপ্তি ও স্বীকৃতি। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি। দেব-দ্বিজে ভক্তি, ধর্ম-কর্ম-আধ্যাত্মিকতা তথা সাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সমাজ প্রগতিমূলক কর্মে অনাবিল আনন্দ।

মকর : জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থতায় প্রবাস। উর্ধতন কতৃপক্ষের চাপের কারণে কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা ও মানসিক অবসাদ। কর্মছেদ বা কর্মপরিবর্তন হওয়াও অসম্ভব নয়। স্ত্রী অর্থ ও ভাগ্যোন্নতির সহায়ক, সন্তান-সন্ততি প্রেম-ভালবাসায় চালাক ও কৌশলী হবে। অন্ত্যজ শ্রেণীর হিতার্থে মনোনিবেশ।

কুম্ভ : বেকারদের কর্মলাভ ও কর্মে নিযুক্তদের দক্ষতা ও পদোন্নতি, বিদ্যার্থী, ক্রীড়াবিদ, মেকানিক, হার্ডওয়ার ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতিভার স্বীকৃতি। প্রত্যয়দীপ্ত পথ চলার পেশাগত দিকে প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাবে প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ভ্রাতা-ভগ্নী ও মায়ের শরীরের কারণে ব্যয়। শিল্প ও সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণীয় মনোভাব।

মীন : শারীরিক স্বচ্ছতা ও মানসিক উদ্দীপনায় ভরা মন। পরিবহণ-ঔষধি ও বস্ত্রব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ ইতিবাচক ও শুভ। বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে সাফল্যের বারিধারা, বর্ষণ, অপ্রত্যাশিতভাবে কর্মপরিবর্তন এবং কর্মপ্রার্থীদের কর্মসংস্থানের যোগ পরিলক্ষিত হয়। বহুব্যঞ্জন-সহ রসনাতৃপ্তি ও ভ্রমণ যোগ।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

শ্রী আচার্য্য